লরব
কার্ত্তিক
ইনকারাজের গুপ্ত
পূর্বানুবৃত্তি
শীগ্র বিদ্যুৎ গতিতে লাল ভালুকের
উপর লাফিয়ে পড়ল...
এবার লাল ভালুক! রদ্দাটা কেমন লাগছে?
আ আ আঃ
ল ভালুক চিৎ হয়ে পড়ল...
কি সর্দার তোমার লাল ভালুক শয্যা নিলে! আর কেউ লড়বে নাকি আমরা মুক্ত! বলো!
বন্য বিদেশী!
বিদেশী তোমার বীরত্বে আমরা মুগ্ধ! যাও! তোমরা মুক্ত, কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত থেকনা! যাও!
বন্য সর্দার! তোমার কথা চির জীবন মনে রাখবো! চল তরুণ! এ স্বর্ণ নগরী আমাদের বাঙ্গালীর জন্য নয়!
যা বলেছিস!

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অস্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of Public Instructions, West Bengal as a Childrea's Monthly Magazine Vide No. 154 (16) T B. C. *Dated 5 4 '75.*

আলোর ঝরণা ঝরে (কবিতা)
বন্দে আলী মিয়া ৫১৯
দৈত্যদের স্বর্গাভিযান (কবিতা)
সুখরঞ্জন রায় ৫২০
হুসুর মুসুর (গল্প)
শ্রীসুকুমার দে সরকার ৫২১
বেশি চিনি খেয়ো না ৫৩৩
যমলোকে যাত্রা (পৌরাণিক গল্প)
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৫৩৪
বানর কাহিনী (সত্যঘটনা)
বীরু চট্টোপাধ্যায় ৫৩৭
নসীপুরের নিশি (ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী)
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫৪০
বিভীষিকার রাজ্যে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)
পার্থসারথি ৫৪২
চাঁদের চেহারা ৫৪৫
পলাশপুরের বন্ধু (গল্প)
শ্যামলকুমার চক্রবর্তী ৫৪৬
ঐন্দ্রজালিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)
হেমেন্দ্রকুমার রায় ৫৪৯
দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র (রূপকথা)
আর্যভট্ট ৫৫৩
হংকং শহরে দেখা ম্যাজিক (ম্যাজিক)
জাদুকর এ, সি, সরকার ৫৫৭

সম্পাদক : শ্রীরবিদাস সাহারায়
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।
মুদ্রাকর ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

তৃতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
কার্তিক, ১৩৮২ : অক্টোবর, ১৯৭৫
দাম : এক টাকা

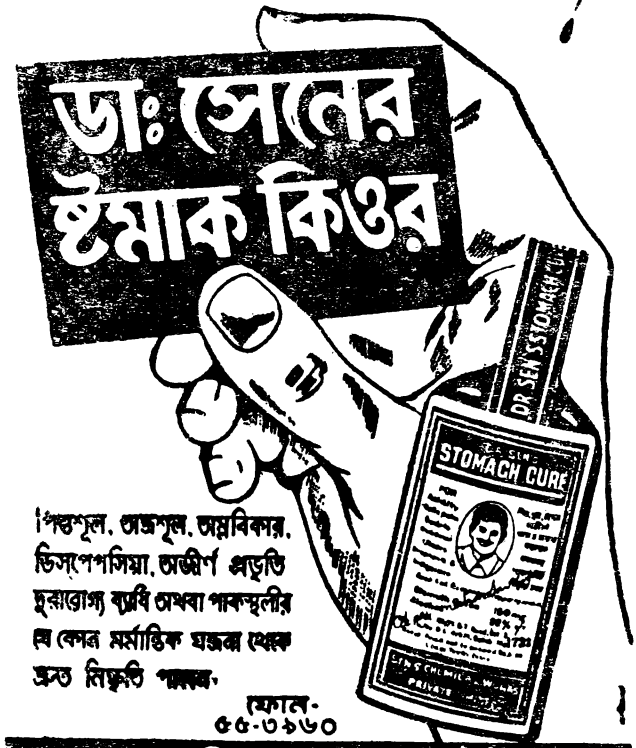

পেটের পীড়ায় অব্যর্থ!
ডাঃ সেনের
ষ্টমাক কিওর
DR SEN'S STOMACH CURE
STOMACH CURE
পিত্তশূল, অন্ত্রশূল, অম্লবিকার,
ডিস্‌পেপসিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি
দুরারোগ্য ব্যাধি অথবা পাকস্থলীর
যে কোন মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে
দ্রুত নিষ্কৃতি
ফোন-
৫৫-৩১৬০
সেনস্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রা) লিঃ
২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-৬

কলরব

সম্পাদক ঃ শ্রীরবিদাস সাহারায়

তৃতীয় বর্ষ ঃ বর্ষসূচী

অগ্রহায়ণ ১৩৮১—কার্তিক ১৩৮২

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
অ			
অচল ঘড়ি ও চালু চোর	(ডিটেকটিভ গল্প)	মনোরঞ্জন ঘোষ	৯৫
আ			
আজব নৌকো	(বিচিত্র সংবাদ)		৭১
আজব জলখাবার	(কার্টুন)	কাজী	৪০৯
আমার দেশ আমার গর্ব	(ভ্রমণ)	শ্রীধর মুন্সি	৪৪, ৯০
আমের কুশি	(নাটিকা)	ফণিভূষণ বিশ্বাস	৩১১
আলোর ঝরণা ঝরে	(কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	৫১৯
আশ্চর্য পাথর	(রূপকথা)	মুরারিমোহন বিট	৩২৯, ৩৮৮
আশ্বিনে	(কবিতা)	সতীরঞ্জন আদক	৪৭২
আস্তিক মুনির নামে কেন সাপ কামড়ায় না		অজিতকুমার ভট্টাচার্য	১৬৪
আষাঢ়ের দিনে	(কবিতা)	রঞ্জিত ভাই	৩২৭
আর্যভট্ট	(বিজ্ঞান বিচিত্রা)	চিত্তরঞ্জন ঘোষাল	২৪৬
আহ্বান	(কবিতা)	বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৯
ই			
ইচ্ছে	(ছড়া)	বারীন বসু	৪৮১
এ			
এই ছবিটা	(কবিতা)	সুনির্মল চক্রবর্তী	৪৮
এক গুচ্ছ ছড়া	(ছড়া)	মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	২৮০
একদিনের সেই ভৌতিক যন্ত্র	(বিজ্ঞান কাহিনী)	বিজ্ঞান ভিক্ষুক	২২০
এক দামাল ছেলের গল্প		রণজিৎ চক্রবর্তী	৫০৭
এক ঘড়া মোহর	(বিদেশী রূপকথা)	অমরনাথ রায়	৪৪০
এ যুগের আশ্চর্যজনক ছেলে			৩২১

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
ঐ			
ঐন্দ্রজালিক	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৭, ৫৯, ১২২, ১৬০, ২০১, ২৫৫, ৩০৭, ৩৬০, ৪০৫, ৪৫১, ৫০১, ৫৪৯
ও			
ওষুধ কে ছুঁচ্ছে	(হাসির কবিতা)	মনোজিৎ বসু	২
ক			
কলরবে আমরা সবে	(কবিতা)	করুণা সেন	৪৭
কালো হাতির বাঘ	(শিকার কাহিনী)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৫৫৮
কুকুরের কীর্তি কাহিনী	(সত্য ঘটনা)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	১৪৫
কৃষক ও বলদ	(গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৩৭
কেশবতী কন্যা	(রূপকথা)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৫৮২
কোম্পানীর কলকাতায় ইংরেজ শিশু		মাধব পাল	৩২২
ক্যানসারের চেয়েও বিপজ্জনক			১৭১
খ			
খড়দা গেলেন বড়দা	(ছড়া)	মুকুলদেব ঠাকুর	১২৯
খাওয়ার পথে কাঁটা	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	২৮১
খাপছাড়া	(ছড়া)	ত্রিনাথ দাস	৪২৪
খুকীর ঝোঁক	(কবিতা)	কবিশেখর কালিদাস রায়	৪৭১
খেলা জিতে	(ছড়া)	বিশ্বনাথ সান্তরা	৩১৭
খোকা আর দমকা বাতাস	(রূপকথা)	বন্দে আলি মিয়া	১৪১
গ			
গল্প হলেও ইতিহাস	(ইতিহাসের গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৪, ১৩৪, ১৮৭
গল্প হলেও সত্যি		শ্রীগোপাল ভৌমিক	২৪৯, ২৮৩
গল্প শোন	(কবিতা)	বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৩৭৫
গাড়ী ধরার ভারী তাড়া	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	৪২৫
গণগণির মাঠে	(ঐতিহাসিক গল্প)	নরেন্দ্রনাথ মল্লিক	৩৫১
গোক্ষুর রাজ	(সাপের বিচিত্র কথা)	শেফালি রায়	১৯০

বর্ষসূচী

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃঃ
ঘ			
ঘড়ির বিচিত্র কথা	(বিজ্ঞান)	বিজ্ঞান ভিক্ষুক	১৬৮
চ			
চাঁদের চেহারা			৫৪৫
চিড়িয়াখানার ছড়া	(ছড়া)	ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪০
চির শরৎ	(কবিতা)	গোপাল ভট্টাচার্য	৪১৪
চেনাশোনার পালা	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	৪৭৩
ছ			
ছড়া		অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৩২
ছড়া		সলিল মিত্র	৪৮১
ছাত্রবন্ধু হেয়ার	(জীবন কথা)	অঞ্জন কর	৩৪০
ছোটদের দুনিয়া	(প্রবন্ধ)	রঞ্জিত ভাই	৪৩০
জ			
জলযোগে প্রাণান্ত	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	৩
জন্মদিনে	(ছড়া)	নরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪
জবাব দাও চটপট			১২, ২২৫
জমির নেশা	(বিদেশী গল্প)	বন্দে আলি মিয়া	৩২
জানো কি ?			১০৪, ২১৩
জুড়ি খোঁজার খেলা			১৬
ট			
টাক	(ছড়া)	অন্নদাশংকর রায়	১৮৫
ট্রাম গাড়ীর গল্প		কিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	৪৯৫
ঠ			
ঠিকে ভুল	(ছড়া)	জয়ন্ত দাশগুপ্ত	৪২৪
ড			
ডাক্তার	(ছড়া)	অজয় বসু	৩২৮
ত			
তিন বোন	(বিদেশী রূপকথা)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৬২
তেনালী রামা	(কৌতুক কাহিনী)	চুনীলাল রায়	৪৩৩
তোমাদেরই মত ছেলে	(বীরত্ব কাহিনী)	শৈলেন দত্ত	৩৮৫

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
ধ			
ধায়ী আমার জামাই	(হাসির কবিতা)	সুনীতি মুখোপাধ্যায়	৩৭৬
দিগ্বিজয়ীর পরাজয়	(গল্প)	নারায়ণ চক্রবর্তী	২৮৯
দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র	(রূপকথা)	আর্যভট্ট	৫৫৩
দৈত্যদের স্বর্গাভিযান	(কবিতা)	সুখরঞ্জন রায়	৫২০
দো পকুড়ি	(ছড়া)	সুদর্শন চক্রবর্তী	৩৭৬
ধ			
ধাঁধা			৪৬, ৯২, ১৩৮, ১৮৪, ২৩০, ২৭৬, ৩২৪, ৩৭২, ৪২০, ৪৬৮, ৫১৬
ন			
নরোত্তম বাবাজীর বীরপুর দর্শন	(ভ্রমণ)	তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৫
নসীপুরের নিশি	(চিত্রকাহিনী)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৯৮, ৩৫৮, ৪০০, ৪৩৮, ৪৯৮, ৫৪০
নামে কি আসে যায়	(গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৭৭
নির্বাক যাত্রী	(ভৌতিক গল্প)	বিমল দত্ত	৪৮৬
প			
পলাশপুরের বন্ধু	(গল্প)	শ্যামলকুমার চক্রবর্তী	৫৪৬
পড়ার ছুটি	(কবিতা)	পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৯৪
পরম রতন	(গল্প)	স্নেহেন্দু মাইতি	৫৬
পরীর বাসা	(রূপকথা)	সঙ্কর্ষণ রায়	২৮৪
পরশুরামের উপাখ্যান	(পৌরাণিক গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২৭০
পদ্য লেখে কেষ্ট কবি	(হাসির কবিতা)	তমাল চট্টোপাধ্যায়	২৩২
পালোয়ান ভীম	(ছড়া)	রাম চট্টখুণ্ডী	২৮০
পীথাগোরাস	(বিজ্ঞান কাহিনী)	ডক্টর পার্থসারথি চক্রবর্তী	৪১৯
পুতুলের লড়াই	(চিত্র কাহিনী)	প্রেমেন্দ্র মিত্র	৩০, ৬০, ১১০, ১৫৪, ২০৮, ২৬৮
পুষি বেড়াল	(গল্প)	শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা	১৮২
প্রতিশোধ	(শিকার কাহিনী)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২৬১
প্রথম ইংরেজের ফাঁসি	(প্রবন্ধ)	অমিতাভ রায়	১৭৬
পৃথিবীর রহস্যভেদ	(প্রবন্ধ)	সুখরঞ্জন রায়	১১৭

বর্ষসূচী

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
ফ			
ফাল্গুন এলো	(কবিতা)	বিশ্বপ্রিয়	১৬৭
ফুরো কার্বন	(বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ)	ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী	৩০০
ব			
বই পড়ার সুফল	(আশ্চর্য কাহিনী)	গৌরী রায়	১৫৩
বানর কাহিনী	(সত্যঘটনা)	বীরু চট্টোপাধ্যায়	৫৩৭
বনের প্রাণী বনকে জানি	(গল্প)	স্বপন বুড়ো	১১২
বাইসাইকেল কেমন করে এলো		অমরনাথ রায়	৭
বাজাও সা রে গা মা	(নাটিকা)	অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৩৬
বাণী বন্দনা	(কবিতা)	শান্তশীল দাস	১৩
বাসনা	(কবিতা)	মোহন মিত্র	১৮৬
বাহাদুর	(ছড়া)	সুদর্শন চক্রবর্তী	১৮৬
বিজ্ঞানের গল্প		জ্ঞান ভিক্ষুক	৭২
বিদ্যাবতীর প্রশ্ন	(অলৌকিক কাহিনী)	নারায়ণ চক্রবর্তী	২৯৩
বিভীষিকার রাজ্যে টারজান	(অ্যাডভেঞ্চার)	পার্থসারথি	৩৮, ৮১, ১৩০, ১৭৮, ২২২, ২৮২, ৩১৮, ৩৬৭, ৪১৫, ৪৬৪, ৫১২, ৫৪২
বীজগণিতের আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট		ডঃ পার্থসারথি চক্রবর্তী	৪৬
বুড়ো আংলার ভ্রমণ	(রূপকথা)	শ্রীধর মুন্সি	২০৫
বুমেরাং	(গল্প)	বেলা দেবী	৪৯০
বৌদ্ধপণ্ডিত শীলভদ্র	(কাহিনী)	জয়দেব রায়	২৪৩
ব্যাটবল	(ছড়া)	ধীরেন করগুপ্ত	৪২৪
ভ			
ভয়ঙ্কর রাত্রি	(দুঃসাহসিক গল্প)	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	১০
ভাস্করাচার্য	(বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	চিত্তরঞ্জন ঘোষাল	৩৩৭
ভূতো মামা, ভূত এবং ফড়িং	(ভৌতিক গল্প)	অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়	৪১০
ম			
মজার মানুষ লুইস ক্যারোল		উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৪৭৯
মৎস্যোপাখ্যান	(পৌরাণিক গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৭০
ময়না বুড়ী	(গল্প)	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৫
মহর্ষি কণাদ	(বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ)	চিত্তরঞ্জন ঘোষাল	৪৬১
মানুষের বন্ধু	(নিবন্ধ)	জয়দেব রায়	৩৩৭
ম্যাক্সিম গোর্কি	(জীবন কথা)	সুধাংশু গুপ্ত	২৮৭
মিঠুর পৃথিবী	(গল্প)	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
মৃত্যুর মুখ থেকে	(শিকার কাহিনী)	অমলকুমার মিত্র	১৯৮

বিষয়		লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
য			
যমলোকে যাত্রা	(পৌরাণিক গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫৩৪
র			
রতন বৈরাগী	(গল্প)	মঞ্জিল সেন	১৭২
রবি দাদু	(কবিতা)	রঞ্জিৎবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩১
রহস্যে ঘেরা কুমেরু	(অভিযান)	অমলকুমার মিত্র	৩৬৪
রাণী না দেবী	(কাহিনী)	গৌরী সাহারায়	৫০৬
রেখে গেলাম প্রীতি	(কবিতা)	করুণাময় বসু	৪২৩
ল			
লেজ কাটা ইঁদুর	(গল্প)	আর্যভট্ট	১২৬
লেগস্ আপ	(ডিটেকটিভ গল্প)	মনোরঞ্জন ঘোষ	৩০১
লোভে পাপ	(আতঙ্কের গল্প)	বিমলেন্দু চক্রবর্তী	২৫০
শ			
শতাব্দীর অভিশাপ	(ভৌতিক কাহিনী)	চিত্তরঞ্জন রায়	২২৬
শরৎ সকালে	(কবিতা)	পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৫১১
স			
সাগর পাড়ি দিল যারা	(অভিযান)	রবিদাস সাহারায় ৫৫, ১১৬,	১৬৪
সাবধানের মার নেই	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	১৪৮
সাধু দর্শনের ফল	(গল্প)	বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৪০২
সাধ্য ছিল কারো	(ছড়া)	ধীরেন করগুপ্ত	৫৮
সামার ভেকেসান	(কবিতা)	অহীভূষণ চৌধুরী	২০৯
সাহায্যের বাক্স	(বিচিত্র সংবাদ)		২৩
সাহিত্যিকের কৌতুক		শীলা চক্রবর্তী	৪৪৪
সিদ্ধির কুচুরী	(ভৌতিক গল্প)	বিমল দত্ত	৩৪
সিনেমার জন্মকথা বলি শোন		সমর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬
সেই আর্তনাদ	(ভৌতিক গল্প)	চিত্তরঞ্জন রায়	৩৪১
স্মৃতি	(কবিতা)	মধুশ্রী মৈত্র	৪৭২
হ			
হংকং শহরে দেখা ম্যাজিক	(ম্যাজিক)	জাদুকর এ. সি. সরকার	৫৫৭
হরিঘোষের গোয়াল			৩৩৬
হাওয়া বদলান হর্ষবর্ধন	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	১৯২
হাতের কাজ	(রূপকথা)	সুনীল সরকার	২৩৯
হাসতে নেই মানা	(কৌতুক)	৯, ৭৭, ১০৯, ১৫৯,	২৬০
হাসি	(কবিতা)	কবিশেখর কালিদাস রায়	১
হুতুর মুতুর	(গল্প)	সুকুমার দে সরকার	৫২১

৩য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : কার্তিক, ১৩৮২ : অক্টোবর, ১৯৭৫

আলোর ঝরণা ঝরে

বন্দে আলী মিয়া

শোনো গো খোকন বহুকাল আমি আছিলাম এই ঠাঁয়
তুমি কোনোদিন ক্ষণিকের তরে আসোনিকো কভু হায়।
ফাগুনের দিনে নীলিম আকাশে উঠিত রূপালি চাঁদ
তারার প্রদীপ সারা নিশি জাগি জাগাইত মনে সাধ।
বৈশাখ মাসে নিকষ মেঘের জমিত পাহাড় যেন
বিজলী চমকে গরজিত মেঘ সাগরেব ডাক হেন।
আষাঢ় শাওনে বাদলের ধারা অঝোরে পড়িত ঝরি
তোমার কথাটি জাগিত স্মরণে—পরাণ উঠিত ভরি।
আজ চেয়ে দেখ আকাশে বাতাসে আলোর ঝরণা ঝরে
শরৎ এসেছে ভুবন ভরিয়া—এসেছে তোমার তরে।
বিলের বুর্কেতে কুমুদ শাপ্‌লা ফুটেছে কত না ফুল
সোনার খোকন, চলো যাই মাঠে তুলে আনি বিলকুল।
ছোটো ঘরখানি সাজাই দু'জনে ফুল দিয়া মালা গাঁথি
পাপড়ি ছড়ায়ে আজ আমাদের শয়নের ঠাঁই পাতি।
তুমি আর আমি—আমি আর তুমি আর হেথা কেহ নয়
খোকন মাণিক তুমিই একাকী রবে মোর গৃহময়।

দৈত্যদের স্বর্গাভিযান

সুখরঞ্জন রায়

দৈত্য দানোর নেতা এসে
হুংকারিয়া কয়,
"স্বর্গে চলো, করব সেথা
দেবতাদের জয়।"
স্বর্গপুরে দেবদেবীরা
উঠল কেঁপে ডরে,
তৈরী হলো সৈন্যদলে
বৈরী নিধন তরে।
ঐদিকে সব দৈত্য মিলে
বিশাল মই এক আনে,
তরতরিয়ে উঠল বেয়ে
স্বর্গ-দ্বারের পানে।
পৈশাচিক সে হর্ষে তাদের
স্বর্গ ওঠে টলে,
দেবসেনারা ভয়েই তখন
পালায় দলে দলে।

মই থেকে ঐ ঝাঁপিয়ে পড়ার
আর নেই তো দেরী,
এই বুঝি রে উঠল বেজে
স্বর্গ-জয়ের ভেরী!
এমন সময় কি হলো রে
কীসে যেন ঠেকে
মইটি হঠাৎ ছিট্‌কে পড়ে
স্বর্গ-দুয়ার থেকে,
থম্‌কে গেল দৈত্য কুলের
'হা রে রে রে' ডাক,
আর্তনাদে মিলিয়ে গেল
স্বর্গ-জয়ের হাঁক।
ফস্‌কে গেল দৈত্য-দানার
স্বর্গ-অভিযান,
ছিট্‌কে সবাই ধরায় পড়ে
হলো গতপ্রাণ।

দেবু কিছুতেই মাথার চুল ছাঁটবে না—

ওর মা বলেন "এই দেবা। মাথায় কি কাক পুষবি? আর জুলপীগুলোর দিকে যে তাকানো যায় না। আজই কানাই নাপ্তেকে আসতে বল। জুলপীগুলো দেখলে যেন মনে হয়, হতভাগার জুলপী ধরে নাচি।

দেবুর মনটা এতদিন খুব খারাপ ছিল। এত খারাপ ছিল যে দেবুর মাও দেবুকে চুল ছাটার কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু যদিও দেবু ইস্কুলের ফার্ষ্ট বয়, যদিও দেবু এই ত সেদিন মহানাদ ইস্কুলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচে তিন গোলে হারতে হারতে থ্রি টু ফোর এ জিতে গিয়েছিল। আর সব ক'টা গোলই দেবু করেছিল। যদিও ভীমকায় গোকুল তার বন্ধু, ঠিক সময়েই ফাউল টাউল করে বল সেণ্টার করেছিল। তবু ভুতো না থাকলে কি কিছু হত?

ভুতো একটা ভুত। ছোট্ট ভুত প্রায় দেবুর বয়সী। অন্য সবাই বলে বটে ভূত আবার থাকতে পারে না কি? যত সব ছেলেমানুষী। তা দেবুও ত এখনও বুড়ো মানুষ হয় নি। তাই ভূতে বিশ্বাস করত। যদিও তার বিশেষ বন্ধু পল্টু আর গোকুলকে, ওদের বাবা নাকি বুঝিয়ে দিয়েছেন 'ভূত' বলে কিছু থাকতে পারে না।

কিন্তু বাবারা ত জানে না যে সত্যি একটা ছায়া ছায়া ভূত—ভুতোর সঙ্গে কি দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল তার।

এর মধ্যে অনেক পুরনো কথা আছে। দেবুর ভূত বন্ধু ভুতো তার ইস্কুল যাবার জলের ফ্লাস্কে থাকত। কত বন্ধুতাই না ছিল।

ভূতেদের ত রাম নাম শুনতে নেই। অথচ আবৃত্তি শেখাবার সময় বি, টি, দিদিমণি কি না তাকে দিয়েই বলালেন ৺সুকুমার রায়ের কবিতা ঃ

"আরে ছি ছি রাম রাম, বোলো না হে বোলো না
চলছে যা জুয়াচুরী নাই তার তুলনা।·····"

দেবু অনেকরকম চেষ্টা করেছিল—আবৃত্তির সময়, রাম রামের বদলে "আম্ আম" বলতে। এমন কি কবি বাল্মীকির মত "মরা মরা" এ সবও বলতে।

দিদিমণি কিছুতেই ছাড়ল না? বলিয়েও ছাড়ল?

আর ভুতো শুদ্ধ জলের ফ্লাক্স ফেটে চৌচির।

তাই ত মা যখন বলল যে "মনে হয় হতভাগাটার জুলপী ধরে নাচি" তখন দেবুর নিজেরই জুলপী ধরে নাচতে ইচ্ছে হয়েছিল।

দেবু বলল—সত্যি বলছ মা? আমার জুলপী ধরে নাচবে? একটু নাচ না মা। লক্ষ্মীটি! নুপুরের নুপুরগুলো এনে দেব? নুপুর দেবুর বড় বোন।

দেবুর মা আকাশে চোখ তুলে বলে গেলেন,

"কট্‌কটেটা বলে আমি এই গাছেতে আছি,
যে ছেলেটা কাঁদে তার জুলপী ধরে নাচি"

দেবু হেসে ছুটতে ছুটতে বলল—ঠিক হোল না। আমি বলব?

"কট্‌কটেটা বলে আমি তাল গাছেতে আছি,
যে ছেলেটা কাঁদে তার জুলপী ধরে নাচি।"

আবার সেই রাঙা-রাঙা লাল সুয্যি ডুবছে। ন্যাড়া তালগাছ যেন বুড়ো আঙুল তুলে সুয্যিকে কলা দেখাচ্ছে। পশ্চিম রেখায় কালো দাগের আঁচড় পড়েছে।

এ হেন সময় নষ্ট করতে আছে?

দেবু তিন তালের তলায় অনেক চেষ্টা করেছিল কাঁদবার। কিন্তু যতই সে চেষ্টা করে ততই তার পেট গুলিয়ে হাসি আসতে থাকে। না কাঁদলে কি করে কট্‌কটেটার দেখা পাওয়া যায়! এমন সময় দেবু দেখল তাল তলায় লাল পিঁপড়ের বাসা। বোধহয় পচা তালই পড়েছিল। পিঁপড়েরা ত জমবেই।

দেবু চোখ কান বুজিয়ে পিঁপড়েদের বাসায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু

কামড়ের চোটে চোখ কি বুজে থাকা যায়? চোখ বেয়ে জল আর মুখ ভরে কান্না। যেন তার ছোট বোনের মত ককিয়ে কেঁদে উঠল।

ওরে বাব্বাঃ, জুলপীতে সে কি টান! কট্‌কটেটা এসে গেছে।

দেবুও তাকেই চাইছিল।

কট্‌কটের জিভটা লজ্জায় ঝুলে পড়ল—আরে দেবু যে!

জুলপীর জ্বালার কান্না থামিয়ে, পিঁপড়েগুলোকে ঝেড়ে ফেলে, রেগে মেগে দেবু বলল—তুমি কি লোক চিনতে পার না?

পেটের তলা থেকে জিভটা গুটোতে গুটোতে তিনবার গড় করে কট্‌কটে বলল—উঃ, কি ভুল! কি ভুল! কিছু মনে করো না দেবু। চিনতে যা একটু দেরী হয়ে গেছল।

আর এদিকে যে তোমাকেই আমি খুঁজে মরছি। জুলপী রেখেছি কি সাধ করে ভাবছ? নেহাৎ তুমি ভুতোর বাবা তা না হলে এমন একটা লাথি তোমার—কসাতাম যে, কি আর বলব?

কট্‌কটে বলল—যাই হোক, ডেকেছ কেন বল?

দেবু বলল—আমার ভুতো বন্ধুকে ফিরে পেতেই হবে।

—তুমি আম আম নাম করলে কেন?

দেবুর চোখে জল এসে গেল—ওই যে বি টি দিদিমণি!

চোখের জল দেখে কট্‌কটের বোধ হয় একটু দুঃখ হয়ে ছিল, বলল—ভুত কি কখনও মরতে পারে? আম নাম শুনেই ভুতো ফেটে গিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। জুড়তে অবশ্য একটু সময় লাগবে।

দেবু বলল—এদিকে আমার মরণ বাঁচন সমস্যা, আর তুমি বলছ জুড়তে সময় লাগবে। পা ঠুকে রাগের চোটে বলল—ভুতগুলো সত্যিই ইয়ে···ইয়ে···মানে ভুতো।

কট্‌কটে হেসে বলল—সমস্যাটা কি বলবে ত?

—কি আবার! রসোগোল্লার কম্‌পিটিশন। তাও আবার গোকুলের সঙ্গে। তোমার কট্‌কটে না কুট্‌কুটো মাথায় ঢুকেছে?

কট্‌কটে হেসে বলল—এটা আবার নাকি সমস্যা। যাই হোক তোমার রসগোল্লার কম্‌পিটিশনটা কিছু ভাববার নয়। আমি এক্ষুণি ডাকছি।

—ডাকবে কাকে ?

কট্‌কটে বলল—আমিও বুড়ো হয়েছি। কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই। এত ভাবছ কেন ?

কট্‌কটে ডাকতে না ডাকতেই, হুসুর মুসুর হাজির। মন্তর অবশ্য বলতে হয়। কট্‌কটে কালকাসুন্দের বনে গিয়ে মন্তর পড়েছিল :

তাল গাছেতে হুসুর মুসুর
বাঁশ গাছেতে থানা,
কালকাসুন্দের বনে আছে
বাদশাহী বিছানা।
আরামগঞ্জের দেবুচাঁদ গো হুজুর !
এসো এসো হুসুর মুসুর !

অবশ্য হুসুর মুসুরকে দেখে দেবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। ভুতটা দেড়-আঙ্গুলে। মাথাটা ছোট। ইয়া জোড়া গোঁফ। আর না ? পেটটাই শরীর, এমন যে পা দুটো প্রায় দেখাই যায় না। নেহাৎ দেবু ভূত বিশ্বাস করে, অথচ ভুতকে ভয় পায় না তাই। না হলে গোকুল আর পল্টু হলে যে কি হোত বলাই যায় না।

—তুই ক্যা রে ? হুসুর মুসুর জিগ্যেস করল।

—ভয় দেখিও না, দেবু বলল—আমি একটুও ভুতকে ভয় পাই না।

গোঁফ চুমরিয়ে হুসুর মুসুর বলল—তবে আমায় ডাকলি কেন ? বেশ বাদশাহী বিছানায় ঘুমোচ্ছিলুম। যখন তখন ঘুম ভাঙাতে আছে নাকি র‍্যা ? দেখবি ?

দেবুর রাগ হয়ে গেল, বলল—ভয় দেখাবে ? ছোঃ, আমি ভুতকে ভয় পাই না।

হুসুর মুসুর কেঁদে ফেলল। টপটপ তার গোঁফ দিয়ে চোখের জল গড়াতে লাগল।

দেখবি দাঁত কিড়মিড় করব ?

দেবু বলল—জিভ বার করে ভেংচি কেটে দেব ?

হুসুর মুসুর অবাক্ ! ভাগ্যিস এই সময় কট্‌কটে ছায়া ছায়া রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল !

—খবরদার ! কট্‌কটে বলে উঠল। দেবুকে ভয় দেখাবি না।

হুসুর মুসুর বলল—দেবু ভয় পায় না। বলে কিনা ভেংচি কেটে দেবো।

দেবু রেগেই ছিল, বলল—ও রকম পেট মোটা আমার ঢের দেখা আছে গোকুলের পেটটা তোমার থেকে কিছু ছোটো নয়।

হুসুর মুসুরেরও সম্মানে আঘাত লেগে গিয়েছিল। সে বলল—তোমার গোকুল কতগুলো রসোগোল্লা খেতে পারে?

দেবু বলল—সেইটাই ত আসল সমস্যা।

দেবু প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে গেল। তারপর বলেই ফেলল—জান গোকুলটা পুরো নেমন্তন্ন খাওয়ার পর এক হাঁড়ি দই খেয়ে পঞ্চাশটা রসগোল্লা খেয়ে ফেলতে পারে। আমি শুধু ভুতোরই ভরসায় গোকুলের সঙ্গে কমপিটিশন করতে গিয়েছিলাম! ভুতোই আমাকে ডোবালে!

কটকটে রেগে মেগে বলল—সে ত বাপু তোমারই দোষ।

—ও সব কথা ছাড়ো। হুসুর মুসুর বলল—আসল কথাটা বল দিকিনি।

—কি?

—রসগোল্লাগুলো ছাগলঘাটার দুধের না সয়াবিনের দুধের? ও সব কিন্তু আমার পেটে সইবে না। পেটটায় একটু তবলা বাজিয়ে হুসুর মুসুর দেখিয়ে দিল।

দেবু বলল—আমাদের রসিক ময়রার দোকানের।

—চিনির রস? না স্যাকারিন? হুসুর মসুর জিগ্যেস করল।

—তা তো জানি না। দেবু একটু অবাক হয়ে বলল।

—যাই হোক। কিছুঁ ভেবো না। আমি ঠিক তোমার পেছনে থাকব।

তারপর এলো শেষের সে দিন। ভয়ঙ্কর!

আরামগঞ্জ স্কুলের মাঠের ঘাস তখন গাঢ় সবুজ। সবুজ ধানগুলো তার থেকে কত ফিকে। কাঁঠাল গাছের পাতাগুলোও সবুজ, কিন্তু কেমন যেন কাল্‌চে কাল্‌চে। চালতা গাছের পাতায় হলদেটে থেকে গাঢ় নীলচে সবুজ রঙের বাহার। ফলসা গাছে সবুজে আর কমলায় মেশামিশি। আর সবুজ আমগাছগুলো যেন সবুজের ভেতর ডুরে ডুরে লাল পাতা ছেড়েছে।

সে দিনটাই সবুজ রকমারী সবুজ। অন্য দিন হলে এমন দিনে দেবুর খুশির শেষ থাকত না। আজ কিন্তু তা হবার নয়।

আজ তার পেটে ছুচোরা ডন মারছে। সকাল থেকে কিছু খায়নি শুধু খেয়েছে মায়ের বকুনী। বকুনী খেলে পেট যে ভরে না একথা বোধহয় বোকারাও জানে।

আজ রসগোল্লার কমপিটিশন। আজ দেবু বোকার মত আগে থেকে কিছু খেয়ে পেট ভরিয়ে রাখতে পারে?

যদিও তার বই বাঁধা কাঁধ ব্যাগটার ভেতর ঘুমোতে ঘুমোতে হুসুর মুসুর আশ্বাস দিয়েছিল—অত ভাবছ কেন? আমি ত আছি।

ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেরা কেউ বাড়ী যায়নি। রসিক ময়রার দোকানে সকলে ভীড় করেছে। মহানাদ ইস্কুলের ছেলেরাও দল্ বেঁধে এসেছে। মহানাদ ইস্কুলের ছেলেদের আসবার একটা বিশেষ কারণ ছিল।

চ্যাম্পিয়ন মহানাদ ইস্কুল, আরামগঞ্জের কাছে হেরেছিল শুধু ওই বাঁশপাতা পাতলা দেবুটার জন্যেই। আরামগঞ্জ একটা ছোট্ট গাঁ, ছোট্ট ইস্কুল। আর তারাই কিনা ফুটবলে মহানাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকে দিল।

মহানাদ ইস্কুলের খেলার মাষ্টারমশাই, ভবতোষবাবু, তাই নিজেও, মনে মনে একটা মতলব ভেঁজে, রসিক ময়রার দোকানে, দেবু আর গোকুলের রসগোল্লার কম্পিটিশনে নিজেই এসেছিলেন।

রসিক ময়রার দোকানে তিল ধারণের জায়গা নেই। লাল বোলতারাও পালিয়েছে। অবশ্য পালাবার আগে একটা বোলতা মহানাদ ইস্কুলের খেলার মাষ্টারের গালে একটা হুল ফুটিয়ে দিয়ে যেতে ভোলে নি।

গায়েই মাখেন নি ভবতোষবাবু। ছেলেরা অবশ্য অনেকেই বলেছিল—একটু চুন আনব স্যার?—একটু গাঁদা পাতার রস দিলে···

ভবতোষবাবু নির্বিকার ভাবে বললেন—কিছু লাগবে না। প্লেয়ারদের কি অত সহজে কাবু হলে চলে?

ভবতোষবাবুর গালটা অবশ্য দেখতে দেখতে, ভুঁড়ির নীচে বাঁশি বাঁধা, রসিক ময়রার ভুঁড়িটার থেকেও ফুলে উঠেছিল।

এমন সময় কাঁসর, ঘণ্টা আর ঢোল।

গোকুল আসছে প্রথমেই, থপথপিয়ে। গলায় আকন্দ ফুলের মালা। শার্টটা ভিজে গেছে আঠায়। এ সময় আর কিছু ফুল তাড়াতাড়ি পাওয়া শক্ত কিনা! আর তার পেছনে ওই কাঁসর, ঘণ্টা, ঢোল। সবাই ত জানে যে হাতী গোকুলকে অন্ততঃ খাওয়াতে কেউ হারাতে পারবে না। তাই আরামগঞ্জ ইস্কুলের সব ছেলেরা তার পেছনে। এমন কি! শত্রু হলেও, মহানাদ ইস্কুলের ছেলেরাও, হাতী গোকুল যে চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা ধরেই নিয়েছিল।

দু'হাতি ধুতিটা কোনো রকমে ঝুলে পড়া ভুঁড়ির তলায় গুঁজতে গুঁজতে, দু' হাতে নমস্কার করে রসিক বলল—এসো এসো বাবারা। যে যত পার খাও। কচুরী, সিঙাড়া, নিমকি, বোঁদে, পান্তুয়া। আজ সব সস্তা। রসোগোল্লা দিতে পারব না। রসোগোল্লা আজ শুধু শুঁটকে দেবু আর হাতী গোকুলের জন্যে। হঠাৎ জিভ কেটে সামলে নিল রসিক—দেবু দাদা আর গোকুল (বাবু) দাদার জন্যে।

এমন সময় ইস্কুলের ব্যাগ কাঁধে দেবু এসে পড়ল। তার সঙ্গে পণ্টু বঙ্কু ছাড়া আর কেউই নেই। হাততালি ত পড়লই না বরং সকলেরই দৃষ্টি যেন কেমন বাঁকা বাঁকা ঠোঁট উল্টানো।

দেবু ব্যাগে দুটো চাপড় মেরে বলল—দেখছিস?

হুসুর-মুসুর ঘুম চোখে বলল—লাগা না। দেখা যাবে।

রসিক ময়রার কি হাসি! এত বিক্রি রসিক জীবনেও দেখেনি। সিঙ্গাড়া, নিমকি, বোঁদে সব জিনিস্। সে দু'হাত মাথার ওপর উঁচু করে বলল—বাবু মশায়রা···

এ হেন সময়ে রসিকের পেটের কাপড়ের কসি খুলে গেল। কোমরের কসি

গুঁজতে গুঁজতে রসিক আবার বলল—বাবুমশয়রা, আমার দিক থেকে একটা সুসংবাদ আছে

ছেলেরা রসিকের কথা শেষ হবার আগেই দিক্‌বিদিক্ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—কি? কি? রসোগোল্লা কি ফুরিয়ে গেছে? একজন বলল—ছাগলঘাটার দুধ কি দই হয়ে গেছে? চিনি পাওয়া যায় নি?

হৈ হৈ কাণ্ড। গোলমালটা একটু থামলে রসিক মুচকি হেসে বলল—আপনেরা যা ভাবছেন সে সব কিছুই নয়। কমফিট্‌শনের রসোগোল্লা ভালই আছে, তবে

—তবে কি? ছেলেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

—এজ্ঞে! রসিক বলল—আমি একটা পেরাইজ দেব ঠিক করেছি। এই কমফিট্‌শনে যে জিতবে সে একটা পেরাইজ পাবে।

—কি? কি প্রাইজ? একগাল হেসে রসিক নিজের ভুঁড়িটা দেখিয়ে দিল।

ছেলেরা হতভম্ব। ভবতোষবাবু কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন। উনিই বললেন—প্রিয় ছাত্রেরা, রসিকবাবু বলছেন যে উনি বিজেতাকে একটা ফুটবল উপহার দেবেন।

ছাত্রদের হৈ হৈ ওঠবার আগেই, আবার ভবতোষবাবু বলতে লাগলেন—আমি কিন্তু রাজী নই। ফুটবলে আরামগঞ্জ মহানাদকে হারিয়েছে বটে। কিন্তু যে জিতবে তাকে একটা ভাল ক্রিকেট সেট প্রাইজ দিতে হবে। তবে একটা কথা থাকবে যে সেটটা দেবু বা গোকুল যেই জিতুক, সেটা কিন্তু ইস্কুলের হবে। আর আমাদের সঙ্গে ম্যাচে হারতে হবে।

দেবু ভীষণ রেগে গিয়েছিল, বলল—কক্ষণও না। হারতে হবে মানে? আমরা বুঝি জিততে পারি না?

একটু হেসে ভবতোষবাবু বললেন—আমি তা বলছিনে। আমাদের ইস্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন। তাই বলছিলাম।

দেবু একটু ভাবল।

আহা বকু ভুতো যদি থাকত, তাহলে কি আর তাকে ভাবতে হোত? কটকটেটা বুড়ো, আর হস্তুর মুস্তুর দেড় প্রাঙ্গুলে। বিছানা পেলেই ঘুমোয়। কিন্তু আশা আছে হাওয়ায় মিলানো ধোঁয়ার মত, ভুতো একদিন, ছায়ার মত জুড়ে যাবেই।

দেবু বলে উঠল—আরামগঞ্জ ইস্কুল, মহানাদ ইস্কুলকে হারিয়ে দেবেই দেবে। কি বলিস্ গোকুল ?

গোকুল বলল—ছাখ দেবু, তুই আমার বন্ধু কিন্তু এই রসোগোল্লার কমপিটিশনে তুই ত আমার কাছে হারবিই। তবু ইস্কুল যদি একটা ক্রিকেট সেট পায়, সেটা আমাদেরই ত লাভ। একটা কথা আছে কিন্তু। আমাদের ক্রিকেট ক্লাবের নাম দিতে হবে "আরামগঞ্জ গোকুল ক্রিকেট ক্লাব"।

দেবু বলল—আর আমি যদি জিতি তাহলে নাম হবে "আরামগঞ্জ হুস্কুর মুস্কুর ক্রিকেট ক্লাব"।

এদিকে রসিক ময়রার মুখে আর ভুঁড়িতে হাসি যেন উপছে পড়ছিল।

সে বলল—হাঃ! তিন কাঠি, এক লাঠি আর এক বল ত? ও আমি কালকেই শরৎ ছুতোরকে দিয়ে করিয়ে রাখব।

ভবতোষবাবু বললেন—অত সোজা নয় হে! দাম আছে।

রসিক ময়রা মুখ বেঁকিয়ে বলল—কত আর দাম হবে? তিন টাকা? চার না হয় পাঁচ টাকা এই ত?

ভবতোষবাবু হেসে বললেন—না হে, একটা ভালো ক্রিকেট সেটের দাম তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা মাত্র।

রসিকের ভুঁড়িটাও যেন চুপসে গেল—পারমুনা বাবু। কিছুতেই পারা—অ-অ সম্ভব নেই।

ভবতোষবাবু হেসে বললেন—ঠিক আছে, তাহলে যে জিতবে, আমিই তাকে একটা ক্রিকেট সেট উপহার দেব। কিন্তু কথা থাকবে যে, সেটা কিন্তু ইস্কুলের সম্পত্তি হবে।

ছেলেদের উল্লসিত চীৎকারে আকাশ ফাটে ফাটে। এদিকে কিন্তু রসিক ময়রার সম্মানে আঘাত লেগেছে। একজন মাত্র ইস্কুল মাষ্টার যদি পারে, সে পারবে না?

—বাঃ! মনে মনে ভাবে রসিক—আজ যে এত লাভ হল সেগুলো কি এই সব ঝামেলা না হলে হত? যেদিন আরামগঞ্জ ইস্কুল মহানাদকে হারিয়ে দিল, সেদিন কি দুই ইস্কুলের ছেলেরাই তার দোকান সাবড়ে খেয়ে যায়নি?

মনের সন্দেহটা বলে—তাহলেও, যে পক্ষই জিতুক পেরাইজ পাবে এটা কি ব্যবসা ?

রসিক বলে ওঠে—ঠিক তো !

—কি বলছ রসিক ? ভবতোষবাবু জিগেস করলেন।

রসিক বলল—আমি বলি কি বাবু ! আমি এক কথার মানুষ। আপনে একা কেন পেরাইজ দেবেন ? বরং এক কাজ করা যাক।

—কি ?

—দেবু জিতলে আমি পেরাইজটা দিমু, আর গোকুল জিতলে আপনে দিবেন। কেমন ?

ভবতোষবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

এইবার শুরু হল লড়াই।

গোকুল বলল—রসিক দাদা এক হাঁড়ি দৈ দাওত।

রসিকও অবাক, দেবুও অবাক।

রসিক বলল—কমফিট্‌শন ত রসোগোল্লার। দৈ কি হবে ?

গোকুল হেসে বলল—আগে রসিক দাদার টোকো দৈ খেলে রসগোল্লার মুখ আপনি তৈরী হয়ে যাবে। বরং পারিস ত তুই এক খুরী খেয়ে নে !

রসিক ময়রা রেগে মেগে বলল—কিন্তু দইয়ের দামটি কে দেবে ?

ভবতোষবাবু হেসে বললেন—আচ্ছা ওটা না হয় আমিই দিয়ে দেব। তুমি দাও ত !

ভীষণ চটে মটে রসিক ময়রা বলল—থাক মশয় ! অত আর দাতব্যি করতে হবে না। যে দৈ বানাতে জানে সে খাওয়াতেও জানে।

এদিকে তখন দেবু ইস্কুল ব্যাগটা খুলে বই হাতড়াচ্ছে। ব্যাগটা খোলা মাত্র একলাফে দেড় আঙুলে হুস্মুর মুস্মুর দেবুর কাঁধে চড়ে বসেছে। কে তাকে দেখতে পাবে ? দেখতে পেতে গেলে সেরকম বিশ্বাস থাকা চাইত।

গোকুল বলল—এই দেবু তুই ব্যাগ হাতড়াচ্ছিস ক্যান রে ?

—স্বাস্থ্যের বইটা, দেবু বলল, একটু খুঁজে দেখছি।

হো হো করে হেসে উঠল গোকুল—স্বাস্থ্যর বই দেখে খাবি? সবই ত উল্টো পাল্টা। কই গো রসিক দাদা দাও না। আমাকে এক হাঁড়ি আর দেবুকে এক খুরী দই।

গোকুলের তখনও খাওয়া হয়নি, দেবু বলল—রসিক দাদা, গোকুলের জন্যে আর দু হাঁড়ি দৈ দাও ত।

গোকুল আর ছেলেদের চোখ তখন দইয়ের হাঁড়ির মত হেঁড়ো হয়ে উঠেছে।

পল্টু দেবুকে বলে উঠেছিল—কি করছিস?

—দেখনা! দেবু উত্তর দিয়েছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য দেবু আর হুসুর মুসুরের কথা হয়ে গিয়েছিল।

দেবু। কি গো হুসুর মুসুর?

হুসুর মুসুর। নস্যি। নস্যি। চালিয়ে যাও।

গোকুল বলল—রসিক দাদা আমাকে আরো দশটা রসোগোল্লা। দেবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তোকে কটা দেবে?

দেবু তখন বলল—পাঁচটা। গোকুলের হাসি দেখে কে?

হুসুর মুসুর। কি করছ দেবু? মুখে দেব না নাকে?

দেবু। খবরদার। এখন আমার মত তোমাকে চলতে হবে।

এর পরে গোকুল বলল—রসিক দা আর দশটা। তোকে কটা রে দেবু?

দেবু বলল—পনেরটা। হুসুর মুসুরটা তার কাঁধের ওপর এমন লাফ্যলাফি সুরু করেছিল যে কাঁধের ওপর সজোরে দু' একটা চড় চাপড় লাগাতে হয়েছিল। সবাই ভাবল মশা কামড়াচ্ছে বোধ হয়।

যাই হোক, এখন সমান সমান।

গোকুল বলল—আর কুড়িটা।

দেবু জানাল—আর একুশটা।

গোকুল বলল—আর দশটা

দেবু চুপ।

গোকুলের দল হৈ হৈ করে লাফাচ্ছে। দেবু সজোরে কাঁধের মশা মেরে বলল—আর এগারোটা।

পল্টু বলল—কি করছিস রে দেবু?

দেবু জবাব দিল—কি আর বলব? হুস্থর মুস্থর করে খেয়ে ফেলছি।

গোকুল বলল—আর দশটা—

সবাই দেবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দেবু বলল—হিসেব ঠিক রাখা হচ্ছে ত? আচ্ছা দাও আর আটটা। বলে দেবু একটা ঢেঁকুর তুলল।

আবার সমান সমান।

গোকুলের দলে মুচকি হাসি আর দেবু আবার কাঁধে মশা মারছে।

ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে গোকুল বলল—আরও দশটা।

দেবু তখনও চুপ। উঃ কি মশা। আচ্ছা দাও তিরিশটা।

গোকুল অবিশ্বাসী গলায় বলল—খেতে পারবি?

—দেখ না, দেবু বলল—হুস্থর মুস্থর করে উঠিয়ে দেব।

আর গোকুল তখন পাঁচটা খেয়েছে কি না খেয়েছে। দেবুর তিরিশটা শেষ।

গোকুলের চোখ দুটোও তখন রসগোল্লা হয়ে গেছে। সে বলল—এক গেলাস জল।

আর দেবু কাঁধের মশা মেরে বলল—আর তিরিশটা দাও রসিক দাদা।

গোকুল হেউ করে একটা প্রকাণ্ড ঢেঁকুর তুলে কোন রকমে বলল—আর না।

আর এদিকে মুখটা কাঁচু মাচু করে রসিক ময়রা বলল—আর মোটে উনতিরিশটা আছে।

দেবু বলল—ছোঃ। আরও গোটা কতক খাব ভাবছিলুম। যাই হোক তাই দাও।

আরামগঞ্জ ইস্কুলের ক্রিকেট সেট্‌টা ভবতোষবাবু নিজে থেকে কিনিয়ে দিয়েছেন। রসিক ময়রাকে যেন খারাপ লোক ভেবো না। এই যে শুরু হল আরামগঞ্জ আর মহানন্দ ইস্কুলের রেষারেষি। এতে তার ব্যবসা প্রচুর বাড়বে।

চাঁদটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। কার্তিকের এখনও দুটো দিন বাকি। কিন্তু দেবুর গায়ের ওপর খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলেন ওর মা। জানলাটা বন্ধ করা দেবু পছন্দ করে না। ওর খুব দেখতে ভাল লাগে পত্র পল্লবের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে তারা ভরা জোনাকী আকাশ আর পালিয়ে পালিয়ে যাওয়া উকুনে খাওয়া চাঁদ। আর সেই আকাশকে বুড়ো আঙুলে কলা দেখানো, শকুন বসা তিন তাল।

গায়ের ওপর চাদরটা আধো ঘুম চোখে টেনে দিল দেবু। গরমের ওম টুকু সবে গায়ে জড়াচ্ছে, এমন সময় জানলায় টোকা।

—দেবু। দেবু। দেবু? যেন বাতাসের ফিস ফিস ডাক।

দেবু চুপি চুপি জিগ্যেস করল, যেন মা শুনতে না পায়,—কে?

—খোল্ না। আমি ভুতো। গলা শুনেও বুঝতে পারিস না?

বেশি চিনি খেয়ো না

সাবধান, বেশি চিনি খেয়ো না, বেশি কাঁচা মাছ বা বেশি ভাতও নয়। দৃষ্টিশক্তি এতে ক্ষীণ হতে পারে। অথচ আমাদের দেশের অনেকেই কিন্তু এতে খুব অভ্যস্ত। এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন একজন তরুণ বিজ্ঞানী, নাম অধ্যাপক লু-য়ুং-চে। তিনি বলেছেন, বিশেষ করে ১০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে বেশি চিনি খেলে দৃষ্টিশক্তি কম হতে পারে। অধ্যাপক লু জাপান, মালয়েসিয়া, সিঙ্গাপুর ও হংকং-এ গিনিপিগের উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

যমলোকে যাত্রা

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পুরাকালে বাজশ্রবস নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি দুঃখী কাঙালকে অন্ন দান করতেন। তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যও ছিল পরোপকার। তিনি লোকের সকল রকমের দুঃখ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে একবার এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞটির নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ।

আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের নানা দিক থেকে ঋষি-মহর্ষি, জ্ঞানী-গুণী ও ধার্মিকগণ এসে তাঁর যজ্ঞে যোগ দেন। তাঁদের সকলেরও জীবনের লক্ষ্য ছিল জগতের মঙ্গল। যে যজ্ঞের ফলে মানুষের মঙ্গল হবে তাতে কি তাঁরা যোগ না দিয়ে থাকতে পারেন? পরোপকারের মতো মহৎ কর্ম জগতে আর কি?

যাহোক, মহাড়ম্বরে যজ্ঞটি অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ দক্ষিণা দান। দক্ষিণা দান না করলে কোন যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না।

যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এলে বাজশ্রবস ঋষি দক্ষিণা দানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্থলে একপাল গাভী আনেন। যজ্ঞের পুরোহিতগণ গাভীগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে যজ্ঞকার্য সম্পূর্ণ, ও যজ্ঞটি যাতে সফল হয় সেজন্য আশীর্বাদ এবং দেবগণের কাছে প্রার্থনা করবেন।

ঋষি বাজশ্রবসের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলেরই মুখে হাসি। আনন্দ-রবে যজ্ঞস্থান মুখরিত। কিন্তু ঋষি পুত্র কিশোরবয়স্ক নচিকেতা বিষণ্ণ মুখে একপাশে বসে আছেন। তিনি ভাবছেন, 'পিতা একী করলেন? এত বড় একটি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তিনি পুরোহিতদের একপাল অস্থিচর্মসার, বৃদ্ধ গাভী দিচ্ছেন দান করতে হয় নিজের কোন প্রিয় সামগ্রী অথবা কোন উৎকৃষ্ট বস্তু যা পেলে গ্রহীতা প্রসন্ন হবে। কিন্তু বৃদ্ধ

গাভীগুলো পেলে পুরোহিতরা কিছুতেই প্রসন্ন হবেন না। সুতরাং তাঁর যজ্ঞানুষ্ঠান বিফল হবে—তিনি কিছুতেই তাঁর অভীষ্ট ফল লাভ করতে পারবেন না।

নচিকেতা আরও আশঙ্কা করতে লাগলেন, এমন বিরাট যজ্ঞ সংসারের কোন মঙ্গল তো করতে পারবেই না, উপরন্তু পিতার কোন অকল্যাণের কারণ হতে পারে।

তিনি ভাবতে লাগলেন, কি উপায়ে এই যজ্ঞকে সফল ও পিতাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করা যায়? তিনি চিন্তা করে বুঝলেন, সংসারে পুত্রই পিতার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সুতরাং তিনি যদি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তাঁকে দান করতে পিতাকে সম্মত করাতে পারেন, তবেই যজ্ঞ সফল হবে, অমঙ্গল নিবারিত হবে এবং পিতারও কোন অকল্যাণ হবে না।

এই স্থির করে নচিকেতা যজ্ঞস্থলে গিয়ে পিতাকে বললেন, 'যজ্ঞ শেষ হয়ে এল। আপনি দক্ষিণাস্বরূপ আপনার সর্বস্ব দান করলেন। কিন্তু আমায় দান করলেন কাকে?'

বাজশ্রবস ঋষি তখন যজ্ঞকাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। সে জন্য কোন উত্তর দিলেন না।

নচিকেতা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা আমায় দান করলেন কাকে?'

ঋষি ঠাকুর এবারও কোন উত্তর দিলেন না।

নচিকেতা পিতাকে আবার ঐ প্রশ্ন করলেন।

পিতা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং রাগের বশে বললেন, 'তোমায় দিলাম যমকে।'

পিতার কথায় নচিকেতা শিউরে উঠলেন। কিন্তু পুত্রকে যমকে দান করবার কোন ইচ্ছাই বাজশ্রবসের ছিল না। তিনি বিরক্ত হয়ে রাগের বশে কথাটি বলেছিলেন মাত্র। তবু ঋষিবাক্য তো বিফল হতে পারে না, নচিকেতাকে যমগৃহে যেতেই হবে। তিনিও মৃত্যুকে ভয় করেন না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে মাতাপিতা যে গভীর শোক পাবেন, এই কথা মনে করে নচিকেতা অস্থির হলেন।

তিনি পিতাকে বললেন, 'বাবা, আপনি আমার কথা ভুল বুঝে অতি সাংঘাতিক উক্তি করেছেন। আমি বৃথা আপনাকে ঐ প্রশ্ন করিনি। আপনি দক্ষিণাস্বরূপ যে গরুগুলো দান করেছেন, সেগুলো বুড়ো, অস্থিচর্মসার, অল্পকাল পরেই মারা যাবে। যা উৎকৃষ্ট, যা দাতার প্রিয় দক্ষিণাস্বরূপ সেই সামগ্রীই দান করতে হয়। তাতেই যজ্ঞ

সফল হয়ে থাকে। কিন্তু আপনার ঐ দক্ষিণায় এত বড় যজ্ঞ বিফল হবে, এই চিন্তা আমাকে অধীর করেছিল। ভেবে দেখলাম, পুত্রই পিতার অত্যন্ত প্রিয় হয়। সুতরাং আমাকে যদি দান করেন, আপনার যজ্ঞ সফল হবে। তাই ঐ প্রশ্ন করেছি। আপনি ভুল বুঝে সাংঘাতিক উক্তি করেছেন। ঋষি বাক্য মিথ্যা হবার নয়। আমায় যমগৃহে যেতেই হবে। এখন, অনুমতি দিন, আমি যমলোকে যাই।'

নচিকেতার কথা শুনে মুনি ঋষিগণ বিস্মিত হলেন। ঋষি বাজশ্রবসের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি না বুঝে একি সর্বনাশ করেছেন? তাঁর প্রাণাধিক পুত্র নচিকেতা কিশোর বয়সে যমালয়ে যাবে?

তিনি বললেন, 'নচিকেতা, তোমার পিতা হয়ে সত্যই কী আমি তোমায় যমকে দান করতে চেয়েছি? আমার অন্তরের কথা তো তা নয়। ওটা মুখের কথা মাত্র। ঐ কথাকে তুমি বড় বলে ধরছো কেন? মৃত্যু একদিন আসবেই, তার জন্য এত ব্যস্ত কেন?'

নচিকেতা বললেন, 'না বাবা, তা হতে পারে না। আপনি ঋষি। আপনার কথা মিথ্যা হবে, পুত্র হয়ে আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।'

'বিশ্বচরাচর দেখুক ঋষিগণ ভুলেও মিথ্যা বলেন না। তাঁরা সত্যবাক, যা বলেন, তাই সত্য হয়। সংসারে সবই অনিত্য। আপনার অতি স্নেহের নচিকেতাও একদিন থাকবে না। যে কথা আপনি বলেছেন তা ফিরিয়ে নিলেও আমাকে যখন মরতেই হবে তখন আপনাকে মিথ্যাভাষী করে মরবো? তা হয় না। ঋষিবাক্য সত্য হোক, সত্যের প্রতিষ্ঠা হোক। আপনি অনুমতি দিন—আমি যমলোকে যাত্রা করি।'

ঋষি বাজশ্রবস আর দ্বিরুক্তি করলেন না। শান্ত, ধীরকণ্ঠে বললেন, যাও।

তাঁর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলো। সত্যনিষ্ঠ পিতৃভক্ত নচিকেতা নির্ভয়ে যমলোকে যাত্রা করলেন।

বানর কাহিনী

বীরু চট্টোপাধ্যায়

সেবার বলেছিলাম কুকুরের কথা। এবারে বলতে বসেছি বানর বা বানর-জাতীয় জীবদের কথা। ওরাও সাংঘাতিক বুদ্ধি রাখে এবং সাংঘাতিক নকল-নবীশও বটে। হবে না-ই বা কেন। ওরা যে আমাদের পূর্ব পুরুষ।

তোমরা যারা 'টারজান' ছায়াছবি দেখেছ তারা উক্ত চিত্রের শিম্পাঞ্জীটির অভিনব বুদ্ধিবৃত্তির ও সুঅভিনয়ের পরিচয় পেয়ে অবশ্যই বিস্মিত হয়েছ। দেখা যায় বানর, শিম্পাঞ্জী, ওরাংটাং এরা শুধুমাত্র নকলই করে না, নিজেদের বুদ্ধিবলে এমন সব কাজ করে বসে যা মানুষকেও হার মানিয়ে দেয়। দড়িবাঁধা বানরের নানা কৌতুককর খেলা তোমরা রাস্তায় রাস্তায় দেখেছ।

বানর চাকরী করে শুনেছ? করে। তাহলে মালয় দেশের একটি কাহিনী বলি। কতকগুলি বানর চাকরী করে সেখানে, মাইনে তাদের দৈনিক একটি নেয়াপাতি ডাব। এদের কাজ হল গাছ থেকে নারকেল সংগ্রহ করা। এরা পুরুষানুক্রমে একাজ করে আসছে। মালিক হল মানুষ, সে ট্রেনিং দিয়ে এদের তৈরী করে নিয়েছে। এরা এক একজন দৈনিক গাছে উঠে গড়পড়তা একশোটা করে ঝুনো নারকেল খালাস করে আনে। ক্ষিপ্রগতিতে গাছে উঠে এরা মানুষের চেয়েও ভালভাবে নারকেল পেড়ে আনে।

এজন্যে এদের ট্রেনিং শুরু হয় খুবই বাচ্চা বয়সে। মালয়ীরা দু' বছরের বাচ্চা বানর বন থেকে প্রথমে ধরে আনে। গলায় বকলস ও তাতে দড়ি বেঁধে ওদের ছোট ছোট কাজ করতে আজ্ঞা পালন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ওদের সুউচ্চ নারকেল গাছে উঠতে ও গাছ থেকে আদেশ করা মাত্র নামতে শেখানো হয়। গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় হাতের ঝাঁকুনির সাহায্যে এবং মুখের 'উঠে যাও' 'নেমে এস' প্রভৃতি আদেশে ওদের গাছে ওঠা নামা করানো হয়। গাছের ডাইনে বাঁয়ে মাঝখানে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জায়গায় যাতায়াত শেখানো হয় একই পদ্ধতিতে।

ট্রেনিং এর সবচেয়ে কঠিন পর্ব হল ওদের ঝুনো নারকেল চেনানো। ডাব হল বানরদের অতি প্রিয় খাদ্য। সেগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ঝুনোগুলোকে চিনতে হবে, এ শিক্ষায় কিছু সময় লাগে।

মালয়ের এধরণের একজন মালিকের নাম জসুবিন ইসমাইল। তার দশ বছর বয়সের বানর শ্রমিকটির নাম এম্বং। দৈনিক এই বানরটি প্রায় তিনশ পাউণ্ডের মত নারকেল পেড়ে আনত। তাতে মালিকের মাসে আয় হত প্রায় তিনশ টাকা। ছয় বছর ধরে এই এম্বং নিরবচ্ছিন্নভাবে তার মালিকের কাজ করে এসেছে। দৈনিক মজুরী ছিল তার দুটি নেয়াপাতি ডাব। এত দক্ষ বানর আর ধারে কাছে কোথাও ছিল না। অনেকে প্রচুর টাকা দিয়ে ওকে কিনতে চেয়েছে কিন্তু জসু কোন প্রলোভনেই বেচেনি তাকে। অবশ্য জসুর মৃত্যুর পর এম্বংকে আর দেখা যায়নি। হয়ত সে ফিরে গেছে তার বন্য জীবনে।

মালয়ে বানরদের আরও অনেক বিস্ময়কর ধরণের সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাউকে শিক্ষা দেওয়া হয় এক গাছ শেষ হলে গাছের মাথা থেকেই অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে। শিক্ষা দেওয়া হয় নারকেলগুলো ছোট বস্তায় পুরে সেটাকে নিয়ে নেমে আসার। একটি বানর এমন প্রতিভাধর ছিল যে সে মালয় ভাষার তিরিশটি আদেশ নির্দেশাত্মক শব্দ অনায়াসে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে পালন করত।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বানরটার নাম ছিল মেরাহ। সে সর্বপ্রথম ১৯৩৭-এ সরকারী কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়। ওর গুণপনা শুনে সিঙ্গাপুরের বোটানিকাল গার্ডেন্স-এর ডিরেক্টর সাহেব ওকে চাকরী দেন। ওর কাজ ছিল একশ-সোয়াশ ফুট গাছের মগডাল থেকে (যেখানে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়) উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক বিশেষ বিশেষ নমুনা সংগ্রহ করে আনা। ট্রেনিং প্রাপ্ত এই বানরটি বহুকাল একাজ করে গেছে।

এবার বলি আর একটি বানর জাতীয় প্রতিভাধরের কথা। কঙ্গো নামের একটি শিম্পাঞ্জীর আদি নিবাস ছিল আফ্রিকায়। তাকে নিয়ে যাওয়া হল লণ্ডনের রিজেন্টপার্ক জু-তে। পরে সে টেলিভিশন শিল্পী হয়ে গেল। বোঝ একবার কারবার! শিম্পাঞ্জীরা এমনিতে চালাক চতুরই হয়। কিন্তু কঙ্গো যেন অসাধারণ

বুদ্ধিধর, মেধাবী এধং চতুর ছিল মানুষের যে কোন কাজ কর্মের হুবহু নকল করতে তার আদৌ সময় লাগত না। তোয়ালে দিয়ে নিজের খাঁচাকে পরিপাটি ঝেড়ে পুছে দিত। হাততালি দেওয়া ওদের সহজাত অভ্যাস কিন্তু মানুষের মত যথাসময়ে উপযুক্তকালে হাততালি দিয়ে উঠতে কঙ্গোর মত কেউ পারত না। অনেক মজাও করত। চিৎ হয়ে শুয়ে দুহাতের ওপর ভর দিয়ে লাট্টুর মত দেহকে বাই বাই করে ঘোরাতে পারত।

চাল চলন হাব ভাব এতই পাকা ছিল তার যে দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে কঙ্গো এক সময় চিত্রকর হয়ে উঠলো। সে রঙ তুলি দিয়ে ইচ্ছামত ছবি আঁকতে সক্ষম হয়ে উঠলো।

অবশ্য আমেরিকার ইয়র্কস ল্যাবরেটরীর আলফা নাম্নী এক মেয়ে শিম্পাঞ্জীকে ছবি আঁকবার ব্যাপারে পাইওনিয়ার বলা চলে। অজস্র এবং সুন্দর সুন্দর পেন্টিং করেছিল সে।

কঙ্গো ক্রমে ক্রমে পেন্সিল ও ক্রেনয়ের সাহায্যে ছোট ছোট বোর্ডে ছবি আঁকতে লাগলো। নিজের মনের আনন্দে খেয়াল খুশীমত এঁকে গেছে কঙ্গো। শুধু এক রঙা ছবি নয়, এর পর একটি রঙ শুকিয়ে গেলে তার উপর অন্য রঙ চাপিয়ে অদ্ভুত ভাবে ছবি আঁকতে সে পারতো।

পশু বিশারদদের মতে এসব আদৌ জংলী পশুদের বাঁদরামি নয়, এর পেছনে রয়েছে শিম্পাঞ্জীটির অনুশীলিত মেধার সাহায্যে পরিচালিত নিপুণ হাতের তুলিকাটানা প্রকৃত শিল্পকর্ম।

এইসব দেখে শুনে প্রকৃতই তাজ্জব হতে হয় না কি? হয়ত ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন এইসব বনের পশুরা মানুষের বিবিধ গুণের নকল করে এক সময় মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। তখন কাজ বিচারে কে মানুষ আর কে পশু তা নির্ণয় করা বুঝি প্রকৃতই দুরূহ হয়ে উঠবে।

নসীপুরের নিশি

কাহিনী- প্রেমেন্দ্র মিত্র
ছবি - মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ওরা কথা বলতে বলতে একটা তাস ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল। আশ্চর্য তাসটা কে যেন লুফে নিল!

মুখে একথা বললেও সকলের মুখ ভয়ে সাদা হয়ে উঠল।

বসন্ত বলল - তাড়া উধাও, বেড়াল মিলিয়ে গেল। এদিকে ভোর হয়ে আসছে দেখে মনে সকলে জোর পেলাম।

সেবারে অক্ষত দেহেই ফিরেছিলাম। কেবল বসন্তের জ্বর বিকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল

শেষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উকাবো পড়লো একটা পাথরের উপর। পাথরে লেগে একটি দাঁত ভেঙে গেল, আর ভয়ানক আঘাত লাগলো তার নাকে। নাক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

হেনরী কাছেই ছিল, সে ছুটে এসে সর্দারকে বললো—সর্দার, ওকে এমনভাবে মেরো না। ছেড়ে দাও।

সর্দার বললো—ছেড়ে দেবো কেন? আমার ছেলের খবর এই শয়তানটা জানে। হয়তো আমার ছেলেকে ওরা মেরে ফেলেছে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে ওকেও আমি জীবন্ত রাখবো না।

উকাবো রক্তাক্ত মুখ নিয়েই উঠে বসেছিল। সর্দার তাকে আবার একটা প্রচণ্ড লাথি মারতে উদ্যত হলো। হেনরী অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করলো। কিন্তু শক্তিশালী সর্দারের লাথির ঝোঁকটাকে থামাতে গিয়ে নিজেই মাটির উপর পড়ে যাচ্ছিল। টারজান ছুটে এসে তাকে ধরলো।

উকাবো বললো—সর্দার, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার ছেলের খবর জানি না। সে জর্জের আস্তানা থেকে পালিয়ে গেছে।

সর্দার আক্রোশে ফেটে পড়ে বললো—মিথ্যেবাদী, আবার মিথ্যে কথা বলছিস? আমার ছেলেকে তোরাই গুম্ করেছিস।

উকাবো কাতর কণ্ঠে বললো—না, না।

সর্দার আবার লাথি মারলো উকাবোকে। উকাবো আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হেনরী তাকে ধরবার জন্য আসতে চেয়েছিল, কিন্তু টারজান তার হাত ধরে বললো—না, তুমি বাধা দিও না, এটাই বন্য উপজাতিদের রীতি।

হেনরী আর কোন বাধা দিল না। সর্দার উকাবোর পিঠের উপর বসে পড়লো। তারপর উকাবোর ঘাড়টা ধরে বারবার তার মুখটা তুলে পাথরের ওপর আঘাত করতে লাগলো। বিষম যন্ত্রণায় উঠে বসবার চেষ্টা করলো উকাবো। কিন্তু পারলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটলো।

সর্দার বলে উঠলো—শয়তানটা শেষ হয়ে গেছে। ওর জন্যই আমার ছেলের মৃত্যু ঘটলো। আমিও তার প্রতিশোধ নিলাম। এই বলে উকাবোর বিরাট শরীরটাকে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সর্দার। আক্রোশে ও প্রতিহিংসায় তার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

টারজান ও হেনরী সেই মৃতদেহের কাছে এগিয়ে গেল। হেনরী বললো—ডাইনী বৈদ্য বোধহয় মৃত্যুর আগে সত্য কথাই বলেছিল। কিন্তু চক্রান্তের জালে পড়ে গিয়ে ওর জীবনটা গেল।

টারজান বললো—তোমার ওর জন্য দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। যদিও ওর মতলব খারাপ ছিল তবু ওর জন্যই তোমার সৌভাগ্যের বার্তা তোমার কাছে এসে পৌঁছলো। তোমার সৌভাগ্য দেখে সত্যি আমার হিংসা হয় ডাক্তার।

হেনরী বললো—বেশ চলো, দু'জনে গিয়েই না হয় সেই ধনসম্পদ ভোগ করি। তোমার সন্ধান পেয়েছিলাম বলেই আমি আজও জীবনে বেঁচে আছি। *তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ টারজান।* আমাদের দেশে গেলে তোমাকে পরম আদরে রাখবো।

টারজান বললো—এখন চলো, সর্দারের আস্তানায় যাই। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত।

হেনরী বললো—কিন্তু বেচারী সর্দারের মুখের দিকে যে তাকানো যায় না। ছেলেকে হারিয়ে সে যেন মৃতপ্রায় হয়ে আছে।

টারজান বললো—আমার কিন্তু মনে হয় সর্দারের ছেলে বেঁচে আছে। এখনো খুঁজলে হয়তো ওর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চলো, সর্দারের বাড়িতে বিশ্রাম করে ও ক্ষুধা নিবৃত্তি করে ওর ছেলের সন্ধানে বের হবো।

উকাবোকে হত্যা করেও সর্দারের মনের ক্ষোভ দূর হয়নি। ছেলের শোকে সে ভেঙে পড়েছে। টারজান তাকে প্রবোধ দিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

আগে আগে চললো টারজান, মাঝখানে সর্দার আর পেছনে ডাক্তার হেনরী। সর্দারের পা যেন কিছুতেই বাড়ির দিকে চলতে চায় না। কোন রকমে শরীরটাকে টানতে টানতে বাড়ির কাছে আসতে না আসতেই সর্দার চমকে উঠলো। কে যেন তাকে ডাকছে—বাবা! বাবা!

তার ছেলে মানচুর কণ্ঠস্বর।

তাহলে কি মানচু বেঁচে আছে?

সর্দার তাকিয়ে দেখলো, সত্যি মানচু তার দিকে ছুটে ছুটে আসছে। ছুটতে ছুটতে সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

মানচু কাছে এসে বললো—বাবা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সর্দার তার ছেলেকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো—তুই বেঁচে আছিস মানচু? এতদিন কোথায় ছিলি?

মানচু বললো—আমাকে ওরা আটকিয়ে রেখেছিল বাবা। আমি ওদের চোখে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি।

সর্দার ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন নূতন জীবন লাভ করলো। সে ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচলো কিছুক্ষণ। তারপর টারজান ও হেনরীকে বললো—আজ আমার বাড়িতে ভোজ উৎসব হবে। তোমাদের দুজনের সেখানে নেমন্তন্ন।

সারা পল্লীতে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল—সর্দারের ছেলে ফিরে এসেছে! সর্দারের ছেলে ফিরে এসেছে। বেজে উঠলো নানা বাদ্য।

ধুমধাম সহকারে হলো ভোজ উৎসব। সর্দারের অনুচররা ও সেই অঞ্চলের উপজাতিরা সারারাত পর্যন্ত নৃত্যগীতে মেতে রইলো। খাওয়া-দাওয়ার হলো বিরাট আয়োজন।

পরদিন এলো বিদায়ের পালা। হেনরী তার দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হলো। টারজান, সর্দার এবং তার অনুচররা হেনরীকে এগিয়ে দিতে এলো

সমুদ্রের তীর পর্যন্ত। সর্দারের চোখে জল। কিন্তু টারজানের চোখে জল নেই। সে হেনরীকে বললো—বিরাট ঐশ্বর্য পেয়ে এই হতভাগ্যদের কথা ভুলে যেয়ো না ডাক্তার।

হেনরী বললো—না, একথা কি কখনো ভুলতে পারি? আমি আবার আসবো এখানে। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের জন্য এখানে একটি হাসপাতাল খুলবো। হাতুড়ে চিকিৎসায় কত লোক এখানে মারা যায়—আধুনিক চিকিৎসার প্রবর্তন হলে মানুষ আর এমন করে মরবে না।

কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ এসে ভিড়লো। হেনরী বললো—চলো টারজান, তোমাকেও আমাদের দেশে নিয়ে যাই।

টারজান বললো—না ডাক্তার, আমাকে নগরের আর ঐশ্বর্যের লোভ দেখিও না। আমার এই জঙ্গলের জীবনই ভালো। আমি বেশ আছি!

জাহাজে গিয়ে উঠলো হেনরী। টারজান, সর্দার ও তার দলের লোকেরা সমুদ্রের তীরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো।

ধীরে ধীরে দূরে—অনেক দূরে মিলিয়ে যেতে লাগলো জাহাজ।

শেষ

চাঁদের চেহারা

চাঁদনী রাতে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগে। বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ দেখলেই মনে পড়ে যায় কাজ্‌লা দিদির কথা। এখন কিন্তু চাঁদ এসে গেছে আমাদের অনেক কাছে। রকেটে চেপে আমরা ইতিমধ্যেই ঘুরে এসেছি চাঁদ থেকে। চাঁদের কোথায় কী আছে—কোথায় আছে পাহাড়, কোথায় পাহাড়ের উচ্চতা কতখানি, ওখানকার পাথরে কোন ধাতু আছে কিনা, বায়ুর চাপ কত—আজ আমরা অনেকখানি জেনে ফেলেছি। চাঁদ হল, আমাদের পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ। তার জন্ম হয়েছিল আমাদেরই এই পৃথিবী থেকে। কিন্তু আকারে আমাদের পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক ছোট। আমাদের পৃথিবীর চার-ভাগের একভাগ থেকে একটু বড় হল চাঁদের ব্যাস। অর্থাৎ মাত্র ৩৪৭৬ কিলোমিটার। ঐ ধরণের উনপঞ্চাশটা চাঁদ এক সংগে যোগ করলে তবে যদি তা পৃথিবীর আয়তনের সমান হয়। আয়তনে সমান হলেও ঐ ধরণের একাশিটি চাঁদ লাগবে পৃথিবীর ওজনের সমান হতে। কত ছোট ঐ চাঁদ তবু এই পৃথিবী থেকে কত সুন্দরই না দেখায়।

পলাশপুরের বন্ধু

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

গ্রামের নাম পলাশপুর। এই গ্রামেই ওদের দুজনের বাস। ওরা দুজনে বন্ধু—স্বপন আর খোকন। গ্রামের লোকেরা ওদের দেখলেই বলে ওঠে, 'মাণিক জোড়।'

মাণিকজোড়ই বটে। স্বপন আর খোকনের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। এরকম বন্ধুত্ব খুব কমই দেখা যায়। অনেক সময় ধনী বন্ধু আর গরীব বন্ধুর সঙ্গে খুব বেশী বন্ধুত্ব হয় কম, কিন্তু এদের দুজনের ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটেনি। স্বপন গরীব ঘরের ছেলে। অন্যদিকে খোকন বড় লোকের ছেলে। কিন্তু এতে কোন বন্ধুত্বের অবমাননা তারা করেনি। আচার ব্যবহারে, লেখাপড়ায় খেলাধূলায়, দুজনেই সমান। গ্রামের লোকেরা তাই তাদের খুব ভালবাসে।

সে বছর দুজনেই একসঙ্গে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করল। দুজনেরই পরীক্ষার ফলাফল ভালো। তবে স্বপন আর্থিক অবস্থার জন্য আর পড়াশোনা করতে পারে না। খোকনের বাবা খোকনকে কলকাতার এক ভাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কথা হল, হোষ্টেলে থেকেই খোকন পড়াশোনা করবে।

বেশীদিন দুই বন্ধু একে অপরকে ছেড়ে কোথাও থাকেনি। কোথাও গেলে বেশীদিন একে অপরকে না দেখার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্ করেছে, অবশেষে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে দুজনে একত্রে মিলে মনের সুখে গল্প করে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু এবার ছাড়াছাড়িটা বেশীদিনের। এবার থেকে স্বপন আর খোকনের মধ্যে আগেকার মত মেলামেশা হবে না।

খোকন আজ সব জিনিসপত্তর গোছগাছ করে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। ক্লাস শুরু হবে এবার। আবার আসবে গ্রীষ্মের ছুটিতে। স্বপনের চোখে তাই জল। খোকন তার কাছে এসে স্বপনের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলল, "স্বপন, কাঁদিস নারে। আমি চিঠি দেব। তুইও চিঠি দিবি। গ্রীষ্মের ছুটিতে আসব। তার আগে যদি কোন সুযোগ পাই তাহলে একবার ছুটে আসব।" তার চোখেও জল। দুজনে

দুজনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদল। দুজনে দুজনের দিকে চোখভরা জল নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। অবশেষে যাবার সময় হল। খোকন চলে গেল কলকাতায়।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না স্বপন। মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। খোকন আর তাকে চিঠি দেয় না। প্রথম প্রথম বেশ দুজনের মধ্যে চিঠিপত্র চলেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে চিঠি দেওয়াটা কমে এসেছে খোকনের তরফ হতে। স্বপন ভাবলো, হয়তো লেখাপড়ার চাপের জন্য সময় পায় না। কিন্তু একটা চিঠি দেবার সময় কি হয় না তার! মন তার খারাপ হয়ে যায়।

বেশীদিন নিজেকে সংযত করে রাখতে পারল না স্বপন। একদিন সে খোকনের হোষ্টেলে গিয়ে উঠল। দেখা হল খোকনের সঙ্গে। কিন্তু আগেকার সেই মন আর খোকনের নেই। খোকন যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। অনেক বন্ধু তার জুটেছে। তাদের নিয়েই সে মেতে আছে। স্বপনকে সে যেন আস্তে আস্তে ভুলে যাচ্ছে। খোকনের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই সে সবকিছু বুঝতে পারল। আশ্চর্য, এতদিনের ভালবাসা এই কয় মাসে নিশ্চিহ্ন! ভাবতে থাকে স্বপন। দারুণ আঘাত পেল মনে সে। সেদিনটা সে অবশ্য খোকনের ওখানেই থাকল। আর সেদিনই পেল সে আরও, আরও কঠিন আঘাত।

রাত্রি। খোকনের ঘরে তার বন্ধুরা সব একসঙ্গে জুটেছে। আজ নাকি তাদেরকে খোকনের খাওয়াবার দিন। নানারকম খাবার জোগাড় করেছে খোকন। হৈ-হল্লা হচ্ছে খুব। কিন্তু ততটা নজর কেউ দিচ্ছে না স্বপনের দিকে। খোকন ওদের সঙ্গেই মেতে আছে। তাদের হাবভাব দেখলে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্বপন এখানে অপাংক্তেয়। খোকনের কোন এক বন্ধু স্বপনকে তার গ্রাম্য ভাব ও পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে বিদ্রূপ করল। সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু আশ্চর্য, খোকন কোন প্রতিবাদ করল না। সেও হাসল। আর এতেই আরও বেশী আঘাত পেল স্বপন। পরদিন বিষাদভরা মন নিয়ে সে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এল না খোকন। তার বদলে এল একটা চিঠি। চিঠিই বহন করে আনল খোকনের অসুখের কথা। অসুখের সংবাদ পেয়েই খোকনের বাড়ীর সবাই কলকাতায় গেল। স্বপনও চলল তাদের সঙ্গে। খোকনের অপমানের কথা সে ভুলে গেল। খোকনের ব্যবহারে সে কঠিন আঘাত পেয়েছিল

সত্য, কিন্তু খোকনের প্রতি তার ভালবাসা একটুও কমে যায়নি, আজও সেই ভালবাসা তার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজ করছে। খোকনের অসুখের সংবাদ পেয়ে কান্না পেল তার। থাকতে পারল না স্বপন। সেও চলল কলকাতায়।

হোষ্টেলে খোকনের ঘর। স্বপন খোকনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর খোকন স্বপনের কোলে মাথা রেখে কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরে তার দুটি হাত

ধরে খোকন বলে উঠল, আমাকে ক্ষমা কর স্বপন। আমি তোকে অপমান করেছি। দারুণ মোহে পড়ে আমি একাজ করেছি স্বপন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অন্তর থেকে যে ভালবাসা সেটাই খাঁটি আর টাকার জন্য যে ভালবাসা সেটা অস্থায়ী। আমি সেই ক্ষণস্থায়ী ভালবাসার পেছনে ছুটে-ছিলাম। জানিস স্বপন একটা বন্ধুও আমার এই অসুখে সাহায্য করতে আসেনি। আমার এই অবস্থা দেখেও সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে। কিছুদিন হল তাদের পেছনে আর টাকাকড়ি খরচা করতে পারিনি। বেশী টাকাকড়ি ওড়াচ্ছি বলে বাবা টাকা দেওয়া কম করে দিয়েছিলেন। ফলে আমার বন্ধুরাও গেল দূরে সরে। কিন্তু তুই, তোকে অপমান করা সত্ত্বেও তুই আমাকে ভুলিসনি! তুই আমাকে ঘৃণা করিসনি। স্বপন, আমি আজ বুঝেছি, আমার জীবনে আমার একান্ত বন্ধু স্বপন, আমার পলাশপুরের বন্ধু স্বপন। তুই আমাকে ক্ষমা কর।

কান্নায় ভেঙে পড়ল খোকন। স্বপন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, চুপ কর খোকন, চুপ কর। তার আজ দারুণ আনন্দ, সে আবার খোকনের মধ্যে আগেকার মানুষটিকে ফিরে পেয়েছে।

———

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কয়েকদিন পরে তরফদার রমেনবাবুর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। তাতে লেখা—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার কথামত আমি সেই হানাবাড়ীতে গিয়েছিলুম। বৃদ্ধাকে লেখা সেই চিঠি দু'খানা আমিও পাঠ করেছি এবং পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। যথাস্থানে খবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই :

বৃদ্ধার নাম সৌদামিনী। সে সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। আগে সহোদরের কাছেই থাকতো। তার সহোদর বিপত্নীক, ছয় বৎসরের একটি পুত্রের পিতা। সেই ছেলেটির লালন পালনের ভার ছিল সৌদামিনীর উপরে।

ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসর আগে সৌদামিনী তার সহোদরের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এমন একটি লোককে বিবাহ করেছিল, পূর্ব জীবনে সে নাকি ছিল ডাকাত। বিবাহের ঠিক এক মাস পরেই তার সহোদর হাওড়া পুলের তলায় জলে ডুবে মারা যায়। কিন্তু লাস পাওয়া যাবার পর দেখা যায়, তার গলায় রয়েছে আঙুলের চিহ্ন—যেন কেউ গলা টিপে সৌদামিনীর সহোদরকে হত্যা করেছে। কি কারণে জানি না, ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ বেশী মাথা ঘামায়নি।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিভাবিকা হয় সৌদামিনীই। কিন্তু পিতার মৃত্যুর ছয় মাস

পরেই শিশু পুত্রটিও মারা পড়ে। সেই মৃত্যুর কারণও দৈব দুর্ঘটনা। শিশু নাকি কেমন করে তিনতলা থেকে একতলার উঠানের উপরে পড়ে যায়। তখন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় সৌদামিনী।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বিবাহের পর বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়। তারপর আর সে ফিরে আসেনি। কানা ঘুষায় শোনা যায়, বিদেশে কোথায় নাকি ডাকাতি করতে গিয়ে সে মারা পড়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলেও সৌদামিনীর অর্থের অভাব রইলো না। তবে সে সুখও হলো অল্পকালের জন্য স্থায়ী। হঠাৎ একটি বড় ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বেলে তার আর্থিক সৌভাগ্যকে ব্যর্থ করে দিল। এই হলো সংক্ষেপে সৌদামিনীর ইতিহাস।

এবার আমার কথা শুনুন। আপনি যে ছোট ঘরখানা ভেঙে ফেলবার পরামর্শ দিয়েছেন, সেখানে বসে আমি এক ঘণ্টাকাল কাটিয়ে এসেছি। অবশ্য আমি সেখানে কিছু দেখিওনি, শুনিওনি, কিন্তু কেন জানি না, সারাক্ষণই আমার মনের ভিতরে জেগে উঠছিল কি এক প্রবল আতঙ্ক। মেঝে ভেদ করে যেন কেমন একটা বিষাক্ত ভাপ বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠছিল।

আমি আপনার পরামর্শ মতই কাজ করবো। জনকয় মজুর ঠিক করেছি, তারা আসছে রবিবার সকালেই ঐ ঘরখানা ভেঙে ফেলতে শুরু করবে। সেই সময়ে আপনি উপস্থিত থাকলে অত্যন্ত আনন্দিত হবো। ইতি—

—রমেন্দ্রনাথ রায়

যথানির্দিষ্ট দিনে ও যথাসময়ে আবার তরফদারের হানাবাড়ীতে আবির্ভাব ঘটলো। গিয়ে দেখলেন, মিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়ে রমেনবাবু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

একটা ঘরে প্রথমে ঢোকা হল। কিছুক্ষণ ঘরটার চারদিক লক্ষ্য করে তরফদার বললেন—চৌকিটা আগে সরানো দরকার!

মজুরদের সাহায্যে চৌকিটা সরিয়ে ফেলা হল। দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল, মেঝের ওপর রয়েছে একটা চোরা দরজা। সেটি লোহার শিকল ও তালা দিয়ে বন্ধ।

হাতুড়ী ও সাবল প্রভৃতির সাহায্যে তালা ও শিকল ভেঙে ফেলা হল। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্যাঁতসেতে বন্ধ বাতাসের দুর্গন্ধ।

রমেনবাবু উঁকি দিয়ে কি দেখতে লাগলেন। তরফদার জিজ্ঞেস করলেন—রমেনবাবু, কি দেখছেন ভিতরে?

রমেনবাবু বললেন—মশায় এটা তো একটা চোরা কুঠরি বলে মনে হচ্ছে, ভেতরটা একেবারে অন্ধকার।

তরফদারও উঁকি দিয়ে দেখলেন, তাঁর মনে হল বহুকাল এই চোরা কুঠরি ব্যবহার হয় নি। এর মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে বোঝবার উপায় নেই। তাই বললেন—আলো না নিয়ে নীচে নামা নিরাপদ নয়।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে আনার ব্যবস্থা হল। তরফদার বললেন—আসুন রমেনবাবু আমার পেছনে পেছনে।

রমেনবাবু শিউরে উঠে বললেন—এবার আমার পৈতৃক প্রাণটা যাবে দেখছি।

তরফদার একটুখানি ঢুকেই বললেন—পাশের ঐ দেয়ালটাও ভাঙতে হবে, নইলে ঢোকা যাবে না।

মজুরদের দিয়ে দেয়ালটাও কিছুটা ভাঙা হল। তরফদার রমেনবাবুকে বললেন—এবার এগিয়ে আসুন।

রমেনবাবু সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ও মশায়, আপনি কি গুপ্তধন খুঁজছেন নাকি?

তরফদার জবাব দিলেন—এর মধ্যে যদি গুপ্তধন থাকে তাহলে এটাও মনে রাখবেন যে পাহারা দেবার জন্য এখানে যক্ষেরও অভাব নেই।

কোনরকম হামাগুড়ি দিয়ে দু'জনে সেই চোরাকুঠরিতে ঢুকল। সেখানে আসবপত্রের মধ্যে রয়েছে কেবল একটা লোহার সিন্দুক।

সিন্দুকটায় মরচে ধরে গেছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। চাবি ছিল না, তাই সকলে মিলে অনেক চেষ্টা করে ডালা খোলা হল।

কিন্তু ভেতরে কোন ধন দৌলত বা বহুমূল্য জিনিস পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একখানি হাতে লেখা পুঁথি আর তার উপরে বসিয়ে রাখা একখানা চীনে মাটির রেকাবি।

তরফদার আস্তে আস্তে রেকাবিখানা হাতে করে তুলে নিল। তার মধ্যে জলের মত টল্ টল্ করছে কি একটা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও তরল পদার্থ। তারই

ভিতরে বসানো আছে কম্পাস বা দিগদর্শন যন্ত্রের মত দেখতে একটি ছোট যন্ত্র। একটি কাঁটাও রয়েছে যন্ত্রের মধ্যে এবং সেটা অতি দ্রুতগতিতে ঘোরাফেরা করছে এদিকে আর ওদিকে।

সবাই একটু অবাক হয়ে গেল, সেই জলের মত তরল পদার্থ থেকে চারদিকে যেন অদ্ভুত একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধটা তীব্র নয়, খারাপ কিছু নয়, কিন্তু তরফদারের দেহ মন ও শিরা-উপশিরার মধ্যে সেই অজানা গন্ধ আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। শুধু তরফদারের ওপরে নয়, অন্যান্য সকলের উপরেও সেই প্রভাব পড়তে বিলম্ব হল না।

তরফদারের হাতের আঙুল থেকে মাথার চুলে পর্যন্ত এমন অসহনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাচল করতে লাগল যে, রেকাবিখানা আর ধরে রাখতে পারল না, সেখানা মাটির উপরে পড়ে সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তরল পদার্থটা মেঝের উপরে গড়াতে লাগল এবং যন্ত্রটাও ছিটকে পড়ল একদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চারদিকের দেওয়াল কাঁপতে কাঁপতে দুলতে লাগল—মনে হল কোন বিপুল বপু মহাদানব প্রচণ্ড অক্রোশে তাদের উপরে ধাক্কার পর ধাক্কা মারছে।

ভীষণ আতঙ্কে সকলে চোরাকুঠরির বাইরে পালিয়ে এল।

কিন্তু পালাবার সময় তরফদার পুঁথিখানা আনতে ভুলল না। সেখানা হচ্ছে হাতে-লেখা 'মহার্নির্বাণ-তন্ত্র'। পুঁথির ভিতরে পাওয়া গেল একখণ্ড কাগজ। তার উপরে এই কথাগুলি লেখা—

"এই বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে সচেতন বা অচেতন, জীবন্ত বা মৃত যা কিছু আছে, যন্ত্রের কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলবে আমার ইচ্ছাশক্তির বশবর্তী হয়ে। অভিশপ্ত হোক এই বাড়ি—অশান্তিপূর্ণ হোক এখানকার প্রত্যেক আত্মা।"

পুঁথি, কাগজপত্র ও যন্ত্র আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর সে বাড়িতে আর কোন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি।

সমাপ্ত

দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র

আর্যভট্ট

এমন একটি মেয়ের কথা আজ তোমাদের শোনাব যাকে তোমরা ভালো না বেসে পারবে না। মেয়েটির নাম ক্যালিস্টো। গ্রীস দেশের একটি মেয়ে। এই ক্যালিস্টো ঘরের চেয়ে বনকেই বেশী ভালোবাসত। তাই প্রায় রোজই ঘর থেকে বেরিয়ে সদলবলে চলে যেত বনে শিকার করতে। শিকার করতে গিয়ে ক্যালিস্টো বনের মধ্যে শুনত পাখীদের কূজন, ঝর্ণার কলতান আর দেখত নানা রকম ফুলের হাসি। এইসব দেখে ক্যালিস্টোর মন আনন্দে নেচে উঠত। শুধু ওর মনটা নেচে উঠত না, ও নিজেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে নাচতে গান গাইতে থাকত পাখীদের গানের সুরে সুর মিলিয়ে। ক্যালিস্টোকে দেখলেই মনে হতো ও বুঝি প্রকৃতির কোলে একটি ফুটন্ত সাদা গোলাপ।

ক্যালিস্টো সুন্দরী ঠিকই। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর ওর স্বভাব চরিত্র। সব সময় মুখে হাসি লেগেই আছে। মুখের কথা মধুর চেয়েও মিষ্টি আর অন্তঃকরণ ফুলের মত নরম। যাকেই কাছে পেত তাকেই ও আপন করে নিত নিজের চরিত্রের মাধুরী দিয়ে। এই সুন্দর চরিত্রের জন্যে ক্যালিস্টোকে দেশের সবাই ভালোবাসত। শুধু ক্যালিস্টোকেই নয় ওর একমাত্র ছেলে আর্কাসকেও সবাই প্রীতির চোখে দেখত।

দেশের লোক ছাড়া স্বর্গের দেবতাদের কাছেও ক্যালিস্টো অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ক্যালিস্টোকে দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসত জুপিটার। জুপিটার হল স্বর্গের রাজা। স্বর্গ মর্তের সবাই যাকে ভালোবাসে তার কোন শত্রু থাকতে পারে না, কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্যালিস্টোর ছিল। আর সেই শত্রু হল স্বর্গের রাণী জুনো অর্থাৎ জুপিটারের স্ত্রী।

ক্যালিস্টোকে কি মর্তের কি দেবলোকের সবাই ভালোবাসে বলে ওর মনে ভীষণ হিংসা। সব সময়ই চিন্তা করত কি করে ক্যালিস্টোর ক্ষতি করা যায়।

এমন ক্ষতি যাতে ওকে কেউ ছুচোখে আর দেখতে না পারে। মনে মনে বলত জুনো, আমার চেয়েও সুন্দরী ক্যালিস্টো? দেখি ওর সৌন্দর্য কোথায় থাকে? আমি ওকে একটা জন্তু করে ছাড়ব। আর হলও ঠিক তাই।

একদিন ক্যালিস্টো ওর সঙ্গীদের নিয়ে বনে শিকার করতে গিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছে এমন সময় জুনো গিয়ে হাজির হল সেখানে।

ক্যালিস্টোকে দেখেই ওর মন হিংসায় জ্বলে উঠল। ক্যালিস্টোর সামনে গিয়ে হাত তুলে কয়েকটা যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিস্টোর গোটা চেহারার পরিবর্তন ঘটে গেল। ওর ছুটো হাত ছুটো পা শিকারী প্রাণীর নখরযুক্ত থাবায় পরিণত হল। আর গোটা দেহটা হয়ে গেল খস্‌খসে লোমে ভরা একটা ভল্লুকের মত।

নিজের চেহারা দেখে ভয়ে চমকে উঠল ক্যালিস্টো। ওর চেহারাটা ভল্লুকের মত হলে হবে কি! ওর মনটা তখনো ঠিক রয়েছে মানুষের মনের মত। তাই মানুষের মত মন আর ভল্লুকের মত চেহারা নিয়ে ক্যালিস্টো তখন সেখান থেকে পালিয়ে গেল। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল একটা ছোট্ট পাহাড়ের গুহায়। ক্যালিস্টো কোথা গেল বা ওর কি হলো সে সন্ধান আর কেউ পেল না।

এইভাবে এই ভল্লুক বেশে বনের ফলমূল মৌচাকের মধু আর পাহাড়ী ঝর্ণার জল খেয়ে দীর্ঘ পনের বছর কেটে গেল ক্যালিস্টোর।

এই দীর্ঘ পনের বছরের মধ্যে পার হয়ে গেছে পনেরটি গ্রীষ্ম, পনেরটি ব পনেরটি শরৎ, পনেরটি হেমন্ত এবং পনেরটি শীত ও বসন্ত।

এই পনেরটি গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত এবং শীত বসন্তের মধ্য দিয়ে ক্যালিস্টোর ছেলে আর্কাস বেশ একটি লম্বা চওড়া শক্তিশালী যুবক হয়ে উঠেছে। এই আর্কাসও ওর মা ক্যালিস্টোর মত অত্যন্ত শিকারপ্রিয়। প্রায় রোজই ও শিকারে যেত কোমরে হান্টিং-নাইফ গুঁজে ওর বিশ্বস্ত শিকারী কুকুরকে নিয়ে আর সগৌরবে শিকার করে নিয়ে আসত গাদা গাদা বন্য হরিণ ও হরিণী। রোজ একবার করে শিকারে না যেতে পারলে ওর মন ছটফট করত।

প্রতিদিনের মত সেদিনও শিকারে বেরুলো আর্কাস। কিন্তু সেদিন সঙ্গে শিকারী কুকুরটাকে নিল না। এমনকি হান্টিং-নাইফটাও কোমরে গুঁজল না। হাতে করে নিল শুধু তীর আর ধনুক। অনেকক্ষণ ধরে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে আর্কাস। কিন্তু শিকার আর পাওয়া যাচ্ছে না। সবশেষে হরিণ-হরিণীদের পায়ে-চলা পথের একটা চিহ্ন ধরে তীর-ধনুক হাতে বনের মধ্য দিয়ে এগুতে আরম্ভ করল আর্কাস। এগুতে এগুতে এসে পড়ল একটা খোলা জায়গায়। এসেই দেখে ওর কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা লোমশ ভল্লুক।

ভল্লুকটা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর্কাসের মুখের দিকে। ওর চোখ দুটো জলে ভরা হলেও যেন অসীম মায়া মমতায় ভরা। ভল্লুকটা যেন মানুষের মত কি বলতে চায় ওকে। কিন্তু পারছে না। তাই বুকের বেদনা জল হয়ে চোখে এসে জমেছে। আর্কাসের মায়া হল ভল্লুকটাকে দেখে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই মনে হল হাজার হলেও বন্যজন্তু। চোখে জল থাকলে হবে কি। হয়ত এটাও পশুর একটা ভান বা চাতুরি। সুযোগ পেলেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই চিন্তা করে ধনুকের ছিলায় তীর জুড়ে সেই তীর লক্ষ্য করল আর্কাস ভল্লুকটার দিকে।

তীর ছুঁড়তে যাবে এমন সময় দেবতাদের রাজা জুপিটার এসে ওর হাত থেকে তীর ধনুক কেড়ে নিল। আর্কাস অবাক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জুপিটারের দিকে তাকিয়ে। জুপিটার আর্কাসকে কোন কথা বলতে বারণ করল। আর্কাস নিশ্চুপ।

এখন বলত কেন জুপিটার আর্কাসের হাত থেকে ওর তীর-ধনুক কেড়ে নিল। তোমরা বলতে পারবে না। তাহলে শোন আমি বলছি।

এই ভল্লুকটাই হলো আর্কাসের মা ক্যালিস্টো। ক্যালিস্টো স্বর্গের রাজা জুপিটারের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী। জুপিটার ওর মৃত্যু চায় না। বিশেষ করে ওরই ছেলের হাতে। তাই ক্যালিস্টোর বিপদ দেখে জুপিটার ছুটে এসে আর্কাসের হাত থেকে তীর-ধনুক কেড়ে নিল।

ভল্লুক-রূপী ক্যালিস্টো প্রাণ পেল ঠিকই। কিন্তু জুপিটার ভাবলো এখন কি করা যায়? আমি যদি ক্যালিস্টোর আগের রূপ ফিরিয়ে দিই তাহলে আমার রাণী জুনো আবার ওর ক্ষতি করতে পারে। নাঃ 'ক্যালিস্টোর ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দেব না। ক্যালিস্টো এবং আর্কাস অমর হয়ে থাকবে। আমি ওদের এই মর্তেই আর রাখবো না।

এই চিন্তা করে জুপিটার ক্যালিস্টো এবং আর্কাসকে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিল।

সেই স্বর্গে গিয়ে ওরা দুজনে দুটি টুয়িঙ্কল্ টুয়িঙ্কল্ লিটল স্টার হয়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ এবং শীতল আলো দিতে আরম্ভ করল।

এখন তোমাদের কেউ যদি কোনদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাও তাহলে যে দুটি নক্ষত্র পাশাপাশি বসে তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখবে সেই দুটোরই একজন ক্যালিস্টো আর একজন আর্কাস মনে করবে। যেদিন জুপিটার ওদের নক্ষত্র করেছে সেইদিন থেকে আজো পর্যন্ত ওরা এই পৃথিবীর মায়া ভুলতে পারে নি। তাই আকাশে থেকেও এই পৃথিবীর দিকেই তাকিয়ে থাকে।

ধাঁধার উত্তর

কার্তিক মাসে 'কলরব'-এর বছর শেষ। তাই নূতন ধাঁধা দেওয়া হল না।

আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তর—শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ।

হংকং শহরে দেখা ম্যাজিক

জাদুকর এ. সি. সরকার

উইনার হাউজ হচ্ছে হংকং শহরের এক অভিজাত হোটেল। প্রথমবার যখন হংকং যাই তখন এই হোটেলেই সাময়িক আস্তানা হয়েছিল আমার। আমার ঘরের জানালা দিয়ে একদিকে দেখতে পেতাম সমুদ্রের সুনীল সুষমা আর অন্য জানালা আমার সামনে খুলে ধরতো সবুজবনানী ছাওয়া পাহাড়ী শোভা। দিনটা ছিল সোমবার। টুকিটাকি কেনা-কাটা সেরে হোটেলে ফিরছি দুপুরের কাছাকাছি। পায়ে হেটে আসছিলাম। হোটেলের কাছাকাছি যে পথের মোড় সেই মোড় ফিরতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ল পথের ওপারের একটা ছোটখাটো জটলার উপরে। কৌতুহলের বশে এগিয়ে গেলাম। একজন চীনে জাদুওয়ালাকে ঘিরে ভীড় করেছে পথচারীর দল।

জাদুওয়ালার সামনে এক ছোট টেবিল, তার ওপরে সাজানো তাস, বল, রুমাল ইত্যাদি নানা টুকিটাকি জাদু-সরঞ্জাম। জাদুওয়ালা একটা কালো রঙের বোতল আর এক টুকরো সুতোর দড়ি নিয়ে তাঁর দর্শকদের কী সব বোঝাচ্ছিলেন চীনা ভাষায়।

অল্পক্ষণ পরেই জাদুকর সুতোর দড়িটার এক প্রান্ত গলিয়ে দিলেন বোতলের ভেতরে—বোতলটাকে উল্টো করে ধরে কিসব মন্ত্রতন্ত্র প'ড়ে তাঁর হাতে ধরা দড়ির প্রান্তটা ছেড়ে দিলেন। দড়িটা কিন্তু খসে পড়ল না বোতল থেকে। এর পরে জাদুকর ডান হাত দিয়ে দড়ির ঝুলন্ত প্রান্তটা ধরে বাঁ হাতে ধরে থাকা বোতলটাকে আস্তে নামিয়ে রাখলেন মাটিতে।

আর এক দফা মন্ত্র প'ড়ে এবার যাদুকর ধীরে ধীরে তাঁর ডান হাতে ধরা দড়ির প্রান্তটা উঁচু করে তুলতে সুরু করলেন। সবাই বিস্ময়াহত চোখে দেখলেন দড়ির সঙ্গে ঝুলে বোতলটাও শূন্যে উঠে এলো। কোন বাঁধন নেই ছাধন নেই তবুও দড়িটা কেমন করে ঝুলিয়ে রাখল বোতলটাকে ?

কেমন করে ? আচ্ছা শুনে নাও বলে দিচ্ছি :

দড়িটা এমন মোটা ছিল যে সেটা বোতলের মুখের ভেতরে গলে যাবার পর আশেপাশে অল্পই ফাঁক থাকে।

যাদুকর আগে থেকে বোতলটার ভেতরে ভরে রেখেছিলেন বোতলের মুখের মাপের চেয়ে ছোট একটা গোল নিরেট রবারের গোলা। বোতলের মধ্যে দড়ির প্রান্ত গলিয়ে নেবার পর যাদুকর যখন বোতলটা উল্টো করে ধরেছিলেন তখন মন্ত্র পড়ার ছলে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এই বলটাকে এনে ফেলেছিলেন বোতলের গলা আর বোতলের মোটা অংশের সংযোগ স্থলে। এইখানে এই রবারের গোলাটা খিলের মত দড়ি আর বোতলের ভেতরকার দেওয়ালের মাঝখানে ঢুকে দড়িটাকে বোতলের সঙ্গে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল তার তাই দড়িটা অমনভাবে বোতলটাকে ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছিল।

ভালভাবে অভ্যাস করলে তোমরাও এই মজার ম্যাজিকটা দেখাতে পারবে।

বিশেষ ঘোষণা

আগামী অগ্রহায়ণ মাসে 'কলরব' চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করছে। নূতন বছরে নূতন আকারে এবং লেখায় ও ছবিতে পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার আয়োজন চলছে। সেই সঙ্গে শুরু হচ্ছে প্রতিমাসে গল্প প্রতিযোগিতা। অগ্রহায়ণ মাসের গল্পের বিষয়বস্তু দেশভক্তি। গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে কার্তিক। পৌষ মাসের গল্প প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু—ভাইবোনের প্রতি ভালবাসা। প্রথম পুরস্কার কুড়ি টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার দশ টাকা। গল্প যথাসম্ভব ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮২।

KALARAB REGD. NO. WB CC 237
THIRD YEAR TWELVETH ISSUE—KARTICK 1382 B.S.